পাঠপ্রচয়

দ্বিতীয় ভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৩৬
নূতন সংস্করণ ১৩৫৫ মাঘ
পুনর্মুদ্রণ ১৩৫৬ মাঘ
১৩৫৮ মাঘ

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ, 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু', আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' গ্রন্থ হইতে সংকলিত

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকনাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা।

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা

সূচীপত্র

গল্প ও প্রবন্ধ

কবিতা

কাজের লোক কে

আজ প্রায় চার শত বৎসর হইল, পাঞ্জাবে তলবন্দী গ্রামে কালু বলিয়া একজন ক্ষত্রিয় ব্যাবসা-বাণিজ্য করিয়া খাইতেন। তাঁহার এক ছেলে— নানক। নানক কিন্তু নিতান্ত ছেলেমানুষ নহেন, তাঁহার বয়স হইয়াছে। এখন কোথায় তিনি বাপের ব্যাবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করিবেন তাহা নহে, তিনি আপনার ভাবনা লইয়া দিন কাটান— তিনি ধর্মের কথা লইয়াই থাকেন।

কিন্তু বাপের মন টাকার দিকে, ছেলের মন ধর্মের দিকে— সুতরাং বাপের বিশ্বাস হইল, এ ছেলেটার দ্বারা পৃথিবীর কোনো কাজ হইবে না। ছেলের দুর্দশার কথা ভাবিয়া কালুর রাত্রে ঘুম হইত না। নানকেরও যে রাত্রে ভালো ঘুম হইত তাহা নহে, তাঁহারও দিনরাত্রি একটা ভাবনা লাগিয়া ছিল।

বাবা যদিও বলিতেন ছেলের কিছু হইবে না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাহা বলিত না। তাহার একটা কারণ বোধ করি এই হইবে যে, নানকের ধর্মে মন ছিল, ইহাতে পাড়ার লোকের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বোধ করি, তাহারা নানকের চেহারা, নানকের ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। এমন-কি, নানকের নামে একটা গল্প

প্রচলিত আছে। গল্পটা যে সত্য নয় সে আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে, লোকে যেরূপ বলে তাহাই লিখিতেছি। একদিন নানক মাঠে গোরু চরাইতে গিয়া গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য অস্ত যাইবার সময় নানকের মুখে রোদ লাগিতেছিল। শুনা যায় নাকি, একটা কালো সাপ নানকের মুখের উপর ফণা ধরিয়া রোদ আড়াল করিয়া ছিল। সে দেশের রাজা সে সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন ; তিনি নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রাজার নিজের মুখে এ কথা শুনি নাই, নানকও কখনও এ গল্প করেন নাই, এবং এমন পরোপকারী সাপের কথাও কখনও শুনি নাই— শুনিলেও বড়ো বিশ্বাস হয় না।

কালু অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, নানক যদি নিজের হাতে ব্যাবসা আরম্ভ করেন তবে ক্রমে কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি নানকের হাতে কিছু টাকা দিলেন ; বলিয়া দিলেন, “এক গাঁয়ে নুন কিনিয়া আর-এক গাঁয়ে বিক্রয় করিয়া আইস।” নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু চাকরকে সঙ্গে করিয়া নুন কিনিতে গেলেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের দেখা হইল। নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন, এই ফকিরদের কাছে ধর্মের বিষয় জানিয়া লইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া যখন তাহাদিগকে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাহারা কথার উত্তর দিতে পারে না। তিন দিন তাহারা

খাইতে পায় নাই ; এমনি দুর্বল হইয়া গিয়াছে যে মুখ দিয়া কথা সরে না। নানকের মনে বড়ো দয়া হইল। তিনি কাতর হইয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন, "আমার বাপ কিছু লাভের জন্য আমাকে নুনের ব্যাবসা করিতে হুকুম করিয়াছেন। কিন্তু এ লাভের টাকা কত দিনই বা থাকিবে। দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে। আমার বড়ো ইচ্ছা হইতেছে, এই টাকায় এই গরিবদের দুঃখ মোচন করিয়া, যে লাভ চিরদিন থাকিবে সেই পুণ্য লাভ করি।" বালসিন্ধু কাজের লোক ছিল বটে, কিন্তু নানকের কথা শুনিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে কহিল, "এ বড়ো ভালো কথা।" নানক তাঁহার ব্যাবসার সমস্ত টাকা ফকিরদের দান করিলেন। তাহারা পেট ভরিয়া খাইয়া যখন গায়ে জোর পাইল তখন নানককে ডাকিয়া ঈশ্বরের কথা শুনাইল। তাহারা নানককে বুঝাইয়া দিল—ঈশ্বর কেবল একমাত্র আছেন, আর সমস্ত তাঁহারই সৃষ্টি। এসকল কথা শুনিয়া নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল।

তাহার পরদিন নানক বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত লাভ করিলে?" নানক বলিলেন, "বাবা, আমি গরিবদের খাওয়াইয়াছি। তোমার এমন ধন লাভ হইয়াছে যাহা চিরদিন থাকিবে।" কিন্তু সেরূপ ধনের প্রতি কালুর বড়ো-একটা লোভ ছিল না। সুতরাং তিনি রাগিয়া ছেলেকে মারিতে লাগিলেন। এমন সময় সে প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নাম রায়বোলার।

নানককে মারিতে দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে? এত গোল কেন?" যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন তখন তিনি কালুকে খুব করিয়া তিরস্কার করিলেন; বলিলেন, "আর যদি কখনও নানকের গায়ে হাত তোল তো শাস্তি পাইবে।" এমন-কি, রাজা অত্যন্ত ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিলেন। লোকে বলে যে, যখন সাপ নানককে ছাতা ধরিয়াছিল তখন রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন, এইজন্যই নানকের উপর তাঁহার এত ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে সাপের ছাতাধরা সমস্তই গুজব। আসল কথা, নানকের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নানক একজন মস্ত লোক।

নানকের উপর আর তো মারধোর চলে না। কালু অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন।

জয়রাম নানকের ভগিনীপতি। পাঠান দৌলৎখাঁর শস্যের গোলা জয়রামের জিম্মায় ছিল। কালু স্থির করিলেন, নানককেও জয়রামের কাজে লাগাইয়া দিবেন, তাহা হইলে ক্রমে নানক কাজের লোক হইয়া উঠিবেন। নানকের বাপ যখন নানকের কাছে এই প্রস্তাব করিলেন তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা।" এই বলিয়া নানক সুলতানপুরে জয়রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দিনকতক বেশ কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের উপরেই তাঁহার ভালোবাসা ছিল, এইজন্য সুলতানপুরের সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিতে

লাগিল। কিন্তু কাজে মন দিয়া নানক তাঁহার আসল কাজটি ভুলেন নাই। তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বদাই ভাবিতেন।

এমনভাবে কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন সকালে নানক একলা বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "নানক, তুমি আজকাল কী লইয়া আছ বলো দেখি। এইসকল কাজকর্ম ছাড়িয়া দাও। চিরদিনের যে যথার্থ ধন তাহাই উপার্জনের চেষ্টা করো।"— ফকির যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, পৃথিবীর ভালো করো, ঈশ্বরে মন দাও; টাকা রোজগার করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার চেয়ে ইহাতে বেশি কাজ দেখে।

ফকিরের এই কথাটা হঠাৎ এমনি নানকের মনে লাগিল যে তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ফকিরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্ছা ভাঙিতেই তিনি গরিব লোকদিগকে ডাকিলেন ও শস্য যাহা-কিছু ছিল সমস্ত তাহাদিগকে বিলাইয়া দিলেন। নানক আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না। কাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তিনি পলাইয়া গেলেন।

নানক পলাইলেন বটে, কিন্তু অনেক লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। যাঁহার ধর্মের দিকে এত টান, এমন মধুর ভাব, এমন মহৎ স্বভাব, তিনি সকলকে ছাড়িলেও তাঁহাকে সকলে ছাড়ে না। মর্দানা তাঁহার সঙ্গে গেল; সে ব্যক্তি বীণা বাজাইত,

গান গাহিত। লেনা তাঁহার সঙ্গে গেল। সেই-যে পুরানো চাকর বালসিন্ধু ছেলেবেলায় নানকের সঙ্গে নুন বিক্রয় করিয়া টাকা লাভ করিতে গিয়াছিল, আজ সেও নানকের সঙ্গে চলিল। এবারেও বোধ করি কিঞ্চিৎ ধনলাভের আশা ছিল; কিন্তু যে-সে ধন নয়, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন— সেই ধর্ম। রামদাসও নানককে ছাড়িতে পারিল না; তাহার বয়স বেশি হইয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে বলিত বুড্‌ঢা। আর কত নাম করিব, এমন অনেক লোক সঙ্গে গেল।

নানক যথাসাধ্য সকলের উপকার করিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি ভালোবাসিতেন। হিন্দুধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন, মুসলমানধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন। অথচ হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। নানক আমাদের বাংলাদেশেও আসিয়াছিলেন। শিবনাভু বলিয়া কোন্ এক দেশের রাজা নানা লোভ দেখাইয়া নানককে উচ্ছন্ন দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক তাহাতে ভুলিবেন কেন? উল্টিয়া রাজাকে তিনি ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিলেন।

মোগলসম্রাট বাবরের সঙ্গে একবার নানকের দেখা হয়। সম্রাট নানকের সাধুভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানক তাহা লইলেন না। তিনি বলিলেন, "যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন

দিতেছেন, অনুগ্রহ ও পুরস্কার আমি তাঁহারই কাছ হইতে চাই, আর কাহারও কাছে চাই না।"

নানক যখন মক্কায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন তখন একদিন তিনি মসজিদের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহা দেখিয়া একজন মুসলমানের বড়ো রাগ হইল। সে তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, "তুমি কেমন লোক হে! ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া তুমি ঘুমাইতেছ!" নানক বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, জগতের কোন্ দিকে ঈশ্বরের মন্দির নাই একবার দেখাইয়া দাও দেখি।"

নানক লোক ভুলাইবার জন্য কোনো আশ্চর্য কৌশল দেখাইয়া কখনও আপনাকে মস্ত লোক বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন নাই। গল্প আছে, একবার কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আচ্ছা, তুমি তো একজন মস্ত সাধু— আমাদিগকে একটা-কোনো আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা দেখাও দেখি।" নানক বলিলেন, "তোমাদিগকে দেখাইবার যোগ্য আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল পবিত্র ধর্মের কথা জানি, আর-কিছুই জানি না। ঈশ্বর সত্য, আর-সমস্ত অস্থায়ী।"

নানক অনেক দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থ হইলেন। গৃহে থাকিয়া তিনি সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি কোরান পুরাণ কিছুই মানিতেন না। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন, "এক ঈশ্বরকে পূজা করো, ধর্মে মন দাও, অন্য সকলের দোষ মার্জনা করো, সকলকে

ভালোবাসো।” এইরূপে সমস্ত জীবন ধর্মপথে থাকিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া সত্তর বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

কালু বেশি কাজের লোক ছিলেন কি কালুর ছেলে নানক বেশি কাজের লোক ছিলেন, আজ তাহা হিসাব করিয়া দেখিব। আজ যে শিখজাতি দেখিতেছ, যাহাদের সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী, বিপুল বল, অসীম সাহস দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, এই শিখজাতি নানকের শিষ্য। নানকের পূর্বে এই শিখজাতি ছিল না। নানকের মহৎ ভাব ও ধর্মবল পাইয়া এমন একটি মহৎ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। নানকের ধর্মশিক্ষার প্রভাবেই ইহাদের হৃদয়ের তেজ বাড়িয়াছে, ইহাদের শির উন্নত হইয়াছে, ইহাদের চরিত্রে ও ইহাদের মুখে মহৎ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালু যে টাকা রোজগার করিয়াছিলেন নিজের ভোগেই তাহা খরচ করিয়াছেন, আর নানক যে ধর্মধন উপার্জন করিয়াছিলেন আজ চার শো বৎসর ধরিয়া মানবেরা তাহা ভোগ করিতেছে। কে বেশি কাজের লোক, বলো দেখি।

উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু

মৃত্তিকার নীচে অনেক দিন বীজ লুকাইয়া থাকে। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, "আর ঘুমাইয়ো না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্যের আলো দেখিবে।" আস্তে আস্তে বীজের ঢাক্‌নাটি খসিয়া পড়িল, দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া দৃঢ়রূপে মাটি ধরিয়া রহিল, আর-এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয়, শিশুটি যেন ছোটো মাথা তুলিয়া আশ্চর্যের সহিত নূতন দেশ দেখিতেছে।

গাছের অঙ্কুর বাহির হইলে যে অংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করে তাহার নাম মূল। আর-এক অংশ উপরের দিকে বাড়িতে থাকে, তাহাকে বলে কাণ্ড। সকল গাছেই 'মূল' আর 'কাণ্ড' এই দুই ভাগ দেখিবে। এই এক আশ্চর্যের কথা, গাছকে যেরূপেই রাখ, মূল নীচের দিকে ও কাণ্ড উপরের দিকে যাইবে। একটি টবে গাছ ছিল। পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েক দিন ধরিয়া টবটিকে উল্টা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলাম। গাছের

মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিল, আর শিকড় উপরের দিকে রহিল। দুই-এক দিন পরে দেখিতে পাইলাম যে, গাছ যেন টের পাইয়াছে। তাহার সব ডালগুলি বাঁকা হইয়া উপরের দিকে উঠিল ও মূলটি ঘুরিয়া নীচের দিকে নামিয়া গেল। তোমরা অনেকে শীতকালে অনেকবার মূলা কাটিয়া 'শয়তা' করিয়া থাকিবে। দেখিয়াছ, প্রথমে শয়তার পাতা ও ফুলগুলি নীচের দিকে থাকে। কিছু দিন পরে দেখিতে পাওয়া যায়, পাতা ও ফুলগুলি উপরের দিকে উঠিয়াছে।

আমরা যেরূপ আহার করি গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিস খাইতে পারি। ছোটো ছোটো শিশুদের দাঁত নাই, তাহারা কেবল দুধ খায়। গাছেরও দাঁত নাই, সুতরাং তাহারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি হইতে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল ঢালিলে মাটির ভিতরের অনেক জিনিস গলিয়া যায়। গাছ সেইসব জিনিস আহার করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া যায় ও গাছ মরিয়া যায়।

অণুবীক্ষণ দিয়া অতি ক্ষুদ্র পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল কিংবা মূল এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে। এইসব নল দ্বারা মাটি হইতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।

এ ছাড়া গাছের পাতা বাতাস হইতে আহার সংগ্রহ করে। পাতার মধ্যে অনেকগুলি ছোটো মুখ আছে। অণুবীক্ষণ দিয়া এইসব মুখে ছোটো ছোটো ঠোঁট দেখা যায়। যখন আহার করিবার আবশ্যক হয় না তখন ঠোঁটদুটি বুজিয়া যায়। আমরা যখন প্রশ্বাস ত্যাগ করি তখন প্রশ্বাসের সঙ্গে একপ্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়; তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। ইহা যদি পৃথিবীতে জমিতে থাকে তবে সকল জন্তু অল্প দিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। বিধাতার করুণার কথা ভাবিয়া দেখো। যাহা জন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাই আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয়। গাছের পাতার উপর যখন সূর্যের আলোক পড়ে তখন পাতাগুলি সূর্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া গাছকে বাড়াইতে থাকে। গাছেরা আলো চায়, আলো না হইলে ইহারা বাঁচিতে পারে না। গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা, কী করিয়া একটু আলো পায়। যদি জানালার কাছে টবে গাছ রাখ তবে দেখিবে, সমস্ত ডালগুলি অন্ধকার দিক ছাড়িয়া আলোর দিকে যাইতেছে। বনে যাইয়া দেখিবে, গাছগুলি তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া কে আগে আলোক পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেছে। লতাগুলি ছায়াতে পড়িয়া থাকিলে আলোর অভাবে মরিয়া যাইবে, এইজন্য তাহারা গাছ জড়াইয়া ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, আলোই জীবনের মূল। সূর্যের কিরণ শরীরে ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িতে থাকে। গাছের শরীরে সূর্যের কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে যে আলো ও তাপ বাহির হয় তাহা সূর্যের তেজ। গাছ ও তাহার শস্য আলো ধরিবার ফাঁদ। জন্তুরা গাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে ; গাছে যে সূর্যের তেজ আছে তাহা এই-প্রকারে জন্তুর শরীরে প্রবেশ করে। শস্য আহার না করিলে আমরা বাঁচিতে পারিতাম না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে আমরাও আলো আহার করিয়াই বাঁচিয়া আছি।

কোনো কোনো গাছ এক বৎসরের পরেই মরিয়া যায়। সব গাছই মরিবার পূর্বে সন্তান রাখিয়া যাইতে ব্যগ্র হয়। বীজগুলিই গাছের সন্তান। বীজ রক্ষা করিবার জন্য ফুলের পাপড়ি দিয়া গাছ একটি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করে। গাছ যখন ফুলে ঢাকিয়া থাকে তখন কেমন সুন্দর দেখায়। মনে হয়, গাছ যেন হাসিতেছে। ফুলের ন্যায় সুন্দর জিনিস আর কী আছে ? গাছ তো মাটি হইতে আহার লয়, আর বাতাস হইতে অঙ্গার আহার করে। এই সামান্য জিনিস দিয়া কী করিয়া এরূপ সুন্দর ফুল হইল ? গল্পে শুনিয়াছি, স্পর্শমণি নামে একপ্রকার মণি আছে, তাহা ছোঁয়াইলে লোহা সোনা হইয়া যায়। আমার মনে হয়, মাতার স্নেহই সেই মণি। সন্তানের উপর ভালোবাসাটাই যেন ফুলে ফুটিয়াছে। ভালোবাসার স্পর্শেই মাটি এবং অঙ্গার ফুল হইয়া গিয়াছে।

গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিলে আমাদের মনে কত আনন্দ হয়। বোধ হয়, গাছেরও যেন কত আনন্দ। আনন্দের দিনে আমরা দশজনকে নিমন্ত্রণ করি। ফুল ফুটিলে গাছও তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকিয়া আনে। গাছ যেন ডাকিয়া বলে, "কোথায় আমার বন্ধুবান্ধব, আজ আমার বাড়িতে এসো। যদি পথ ভুলিয়া যাও, বাড়ি যদি চিনিতে না পার, সেজন্য নানা রঙের ফুলের নিশান তুলিয়া দিয়াছি। এই রঙিন পাপড়িগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইবে।" মৌমাছি ও প্রজাপতির সহিত গাছের চিরকাল বন্ধুতা। তাহারা দলে দলে ফুল দেখিতে আইসে। কোনো কোনো পতঙ্গ দিনের বেলায় পাখির ভয়ে বাহির হইতে পারে না। পাখি তাহাদিগকে দেখিলেই খাইয়া ফেলে। রাত্রি না হইলে তাহারা বাহির হইতে পারে না। তাহাদিগকে আনিবার জন্য ফুল সন্ধ্যা হইলেই চারি দিকে সুগন্ধ বিস্তার করে।

গাছ ফুলের মধ্যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছি ও প্রজাপতি সেই মধু পান করিয়া যায়। মৌমাছি আসে বলিয়া গাছেরও উপকার হয়। ফুলে রেণু দেখিয়া থাকিবে। মৌমাছি এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে লইয়া যায়। রেণু ভিন্ন বীজ পাকিতে পারে না।

এইরূপে ফুলের মধ্যে বীজ পাকিয়া থাকে। শরীরের রস দিয়া গাছ বীজগুলিকে লালনপালন করিতে থাকে। নিজের জীবনের জন্য এখন আর মায়া করে না। তিল তিল করিয়া

সন্তানের জন্য সমস্ত বিলাইয়া দেয়। যে শরীর কিছু দিন পূর্বে সতেজ ছিল, এখন তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইতে থাকে। শরীরের ভার বহন করিবারও আর শক্তি থাকে না। আগে বাতাস হু হু করিয়া পাতা নড়াইয়া চলিয়া যাইত। পাতাগুলি বাতাসের সঙ্গে খেলা করিত; ছোটো ডালগুলি তালে তালে নাচিত। এখন শুষ্ক গাছটি বাতাসের ভর সহিতে পারে না। বাতাসের এক-একটি ঝাপ্‌টা লাগিলে গাছটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। একটি একটি করিয়া ডালগুলি ভাঙিয়া পড়িতে থাকে। শেষে একদিন হঠাৎ গোড়া ভাঙিয়া গাছ মাটিতে পড়িয়া যায়।

এইরূপে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়া গাছ মরিয়া যায়।

যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ

এক সময়ে যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ভালোই ছিল। এখন প্রাচীন ভাঙা কোঠাবাড়িটাকে সাপ-ব্যাঙ-বাতুড়ের হাতে সমর্পণ করিয়া খোড়ো ঘরে ভগবদ্‌গীতা লইয়া কালযাপন করিতেছেন।

এগারো বৎসর পূর্বে তাঁহার মেয়েটি যখন জন্মিয়াছিল তখন বংশের সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষ কলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। সেইজন্য সাধ করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কমলা; ভাবিয়াছিলেন, যদি এই কৌশলে ফাঁকি দিয়া চঞ্চলা লক্ষ্মীকে কন্যারূপে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারেন। লক্ষ্মী সে ফন্দিতে ধরা দিলেন না, কিন্তু মেয়েটির মুখে নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন। বড়ো সুন্দরী মেয়ে।

মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধে যজ্ঞেশ্বরের যে খুব উচ্চ আশা ছিল তাহা নহে। কাছাকাছি যে-কোনো একটি সৎপাত্রে বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু, তাঁহার জেঠাইমা তাঁহার বড়ো আদরের কমলাকে বড়ো ঘর না হইলে দিবেন না, পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নিজের হাতে অল্প-কিছু সংগতি ছিল, ভালো পাত্র পাইলে তাহা বাহির করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন।

অবশেষে জেঠাইমার উত্তেজনায় শাস্ত্রাধ্যয়নগুঞ্জিত শান্ত পল্লীগৃহ ছাড়িয়া যজ্ঞেশ্বর পাত্রসন্ধানে বাহির হইলেন। রাজশাহিতে তাঁহার এক আত্মীয় উকিলের বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

এই উকিলের মক্কেল ছিলেন জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী।

তাঁহার একমাত্র পুত্র বিভূতিভূষণ এই উকিলের অভিভাবকতায় কলেজে পড়াশুনা করিত। ছেলেটি কখন যে মেয়েটিকে আসিয়া দেখিয়াছিল তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানিতেন।

কিন্তু, প্রজাপতির চক্রান্ত যজ্ঞেশ্বরের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। তাই বিভূতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনোপ্রকার দুরাশা স্থান পায় নাই। নিরীহ যজ্ঞেশ্বরের অল্প আশা, অল্প সাহস; বিভূতির মতো ছেলে যে তাঁহার জামাই হইতে পারে, এ তাঁহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।

উকিলের যত্নে একটি চলনসই পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি না থাক্‌, বিষয়-আশয় আছে। পাস একটিও দেয় নাই বটে, কিন্তু কালেক্টরিতে ৩২৭৫ টাকা খাজনা দিয়া থাকে।

পাত্রের দল একদিন আসিয়া মেয়েটিকে পছন্দ করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের মিষ্টান্ন ও নাটোরের কাঁচাগোল্লা খাইয়া গেল। বিভূতি তাহার অনতিকাল পরে আসিয়া খবর শুনিল। যজ্ঞেশ্বর মনের আনন্দে তাহাকেও কাঁচাগোল্লা খাওয়াইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু, ক্ষুধার অত্যন্ত অভাব জানাইয়া বিভূতি কিছু খাইল না, কাহারও সহিত ভালো করিয়া কথাই কহিল না, বাড়ি চলিয়া গেল।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় উকিলবাবু বিভূতির কাছ হইতে এক পত্র পাইলেন। মর্মটা এই, যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে তাহার বড়ো পছন্দ এবং তাহাকে সে বিবাহ করিতে উৎসুক।

উকিল ভাবিলেন, এ তো বিষম মুশকিলে পড়িলাম। গৌরসুন্দরবাবু ভাবিবেন, আমিই আমার আত্মীয়কন্যার সহিত তাঁহার ছেলের বিবাহের চক্রান্ত করিতেছি।

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তিনি যজ্ঞেশ্বরকে দেশে পাঠাইলেন, এবং পূর্বোক্ত পাত্রটির সহিত বিবাহের দিন যথাসম্ভব নিকটবর্তী করিয়া দিলেন। বিভূতিকে ডাকিয়া অভিভাবক-মহাশয় পড়াশুনা ছাড়া আর-কোনো দিকে মন দিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। শুনিয়া রাগে বিভূতির জেদ চারগুণ বাড়িয়া গেল।

বিবাহের আয়োজন-উদ্যোগ চলিতেছে, এমন সময় একদিন যজ্ঞেশ্বরের খোড়ো ঘরে বিভূতিভূষণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "এসো বাবা, এসো।" কিন্তু, কোথায় বসাইবেন, কী খাওয়াইবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এখানে নাটোরের কাঁচাগোল্লা কোথায়?

বিভূতিভূষণ যখন স্নানের পূর্বে রোয়াকে বসিয়া তেল মাখিতেছে তখন জেঠাইমা তাহার রজতগিরিনিভ গৌর পুষ্ট দেহটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। যজ্ঞেশ্বরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই ছেলেটির সঙ্গে আমাদের কমলের বিবাহ হয় না কি?"

ভীরু যজ্ঞেশ্বর বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, "সে কি হয়!"

জেঠাইমা কহিলেন, "কেন হইবে না? চেষ্টা করিলেই হয়।" এই বলিয়া তিনি বাথানপাড়ার গয়লাদের ঘর হইতে ভালো ছানা ও ক্ষীর আনাইয়া বিবিধ আকার ও আয়তনের মোদক-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাহারের পর বিভূতিভূষণ সলজ্জে সসংকোচে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিল। যজ্ঞেশ্বর আনন্দে ব্যাকুল হইয়া জেঠাইমাকে সুসংবাদ দিলেন।

জেঠাইমা শান্তমুখে কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে বাপু, কিন্তু তুমি একটু ঠাণ্ডা হও।" তাঁহার পক্ষে এটা কিছুই আশাতীত হয় নাই। যদি কমলার জন্য এক দিক হইতে কাবুলের আমির ও অন্য দিক হইতে চীনের সম্রাট তাঁহার দ্বারস্থ হইত, তিনি আশ্চর্য হইতেন না।

ক্ষীণাশ্বাস যজ্ঞেশ্বর বিভূতিভূষণের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখো বাবা, আমার সকল দিক যেন নষ্ট না হয়।"

বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া বিভূতিভূষণ তাহার বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৌরসুন্দর নিজে নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত ছেলেটিকে মনে মনে বিশেষ খাতির করিতেন। তাঁহার কোনো আচরণে বা মতে পাছে তাঁহার ছেলের কাছে সুশিক্ষা বা শিষ্টতার অভাব ধরা পড়ে, এই সংকোচ তিনি দূর করিতে পারিতেন না। তাঁহার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র যেন বাপকে মনে মনে ধিক্কার না দেয়, যেন অশিক্ষিত বাপের জন্য তাহাকে লজ্জিত হইতে না হয়, এ চেষ্টা তাঁহার সর্বদা ছিল। কিন্তু, তবু যখন শুনিলেন, বিভূতি দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত, তখন প্রথমটা রাগ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। বিভূতি নতশিরে চুপ করিয়া রহিল। তখন গৌরসুন্দর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া নিজেকে

সংশোধন করিয়া লইয়া কহিলেন, "আমি কি পণের লোভে তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি— তা মনে করিয়ো না। নিজের ছেলেকে লইয়া বেহাইয়ের সঙ্গে দরদস্তুর করিতে বসিব, আমি তেমন ছোটোলোক নই। কিন্তু বড়ো ঘরের মেয়ে চাই।"

বিভূতিভূষণ বুঝাইয়া দিল, যজ্ঞেশ্বর সম্ভ্রান্তবংশীয়, সম্প্রতি গরিব হইয়াছেন।

গৌরসুন্দর দায়ে পড়িয়া মত দিলেন, কিন্তু মনে মনে যজ্ঞেশ্বরের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন।

তখন দুই পক্ষে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। আর সব ঠিক হইল, কিন্তু বিবাহ হইবে কোথায় তাহা লইয়া কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না। গৌরসুন্দর এক-ছেলের বিবাহে খুব ধুমধাম করিতে চান, কিন্তু বুড়াশিবতলার সেই খোড়ো ঘরে সমস্ত ধুমধাম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি জেদ করিলেন, তাঁহারই বাড়িতে বিবাহ-সভা হইবে।

শুনিয়া মাতৃহীনা কন্যার দিদিমা কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাঁহাদেরও তো একসময় সুদিন ছিল, আজ লক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া কি সমস্ত সাধ জলাঞ্জলি দিতে হইবে— পিতৃপুরুষের মান বজায় থাকিবে না?— "সে হইবে না; আমাদের ঘর খোড়ো হউক আর যাই হউক, এইখানেই বিবাহ দিতে হইবে।"

নিরীহপ্রকৃতি যজ্ঞেশ্বর অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বিভূতিভূষণের চেষ্টায় কন্যাগৃহে বিবাহই স্থির হইল।

ইহাতে গৌরসুন্দর এবং তাঁহার দলবল কন্যাকর্তার উপর

আরও চটিয়া গেলেন। সকলেই স্থির করিলেন, স্পর্ধিত দরিদ্রকে অপদস্থ করিতে হইবে। বরযাত্র যাহা জোটানো হইল তাহা পল্টনবিশেষ। এ সম্বন্ধে গৌরসুন্দর ছেলের কোনো পরামর্শ লইলেন না। ৮

বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। যজ্ঞেশ্বর তাঁহার স্বল্পাবশিষ্ট যথাসর্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছেন। নূতন আটচালা বাঁধিয়াছেন, পাবনা হইতে ঘি ময়দা চিনি দধি প্রভৃতি আনাইয়াছেন। জেঠাইমা তাঁহার যে গোপন পুঁজির বলে স্বগৃহেই বিবাহপ্রস্তাবে জেদ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় শেষ পয়সাটি পর্যন্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় দুর্ভাগার অদৃষ্টক্রমে বিবাহের দুই দিন আগে হইতে প্রচণ্ড দুর্যোগ আরম্ভ হইল; ঝড় যদি-বা থামে তো বৃষ্টি থামে না, কিছুক্ষণের জন্য যদি-বা নরম পড়িয়া আসে আবার দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হয়। এমন বর্ষণ বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কেহ দেখে নাই।

গৌরসুন্দর পূর্ব হইতেই গুটিকয়েক হাতি ও পালকি স্টেশনে হাজির রাখিয়াছিলেন। আশপাশের গ্রাম হইতে যজ্ঞেশ্বর ছইওয়ালা গোরুর গাড়ির যোগাড় করিতে লাগিলেন। দুর্দিনে গাড়োয়ানরা নড়িতে চায় না— হাতে-পায়ে ধরিয়া দ্বিগুণ মূল্য কবুল করিয়া যজ্ঞেশ্বর তাহাদের রাজি করিলেন। বরযাত্রের মধ্যে যাহাদিগকে গোরুর গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিয়া আগুন হইল।

গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতির পা বসিয়া যায়, গাড়ির চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল। তখনও বৃষ্টির বিরাম নাই। বরযাত্রগণ ভিজিয়া, কাদা মাখিয়া, বিধি-বিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল। হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

বর সদলবলে কন্যাকর্তার কুটিরে আসিয়া পৌঁছিল। অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল। ব্যাকুল যজ্ঞেশ্বর কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করাঘাত করিয়া কেবলই বলিতে থাকেন, "বড়ো কষ্ট দিলাম, বড়ো কষ্ট দিলাম।" যে আটচালা বানাইয়াছিলেন তাহার চারি দিক হইতে জল পড়িতেছে। বৈশাখ মাসে যে এমন শ্রাবণধারা বহিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও আশঙ্কা করেন নাই। গণ্ডগ্রামের ভদ্র অভদ্র সমস্ত লোকই যজ্ঞেশ্বরকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছিল; সংকীর্ণ স্থানকে তাহারা আরও সংকীর্ণ করিয়া তুলিল এবং বৃষ্টির কল্লোলের উপর তাহাদের কলরব যোগ হইয়া একটা সমুদ্রমন্থনের মতো গোলমালের উৎপত্তি হইল। পল্লীবৃদ্ধগণ ধনী অতিথিদের সম্মাননার উপযুক্ত উপায় না দেখিয়া যাহাকে-তাহাকে ক্রমাগতই জোড়-হস্তে বিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বরকে যখন অন্তঃপুরে লইয়া গেল তখন ক্রুদ্ধ বরযাত্রীর দল রব তুলিল, তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে, আহার চাই। মুখ

পাংশুবর্ণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর গলায় কাপড় দিয়া সকলকে বলিলেন, "আমার সাধ্যমতো যাহা-কিছু আয়োজন করিয়াছিলাম, সব জলে ভাসিয়া গেছে।")

দ্রব্যসামগ্রী কতক পাবনা হইতে পথের মধ্যে, কতক-বা ভগ্নপ্রায় পাকশালায় গলিয়া গুলিয়া, উনান নিবিয়া, একাকার হইয়া গেছে। সহসা উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, বুড়াশিবতলা এমন গ্রামই নহে।

গৌরসুন্দর যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতিতে খুশি হইলেন। কহিলেন, "এতগুলা মানুষকে তো অনাহারে রাখা যায় না, কিছু তো উপায় করিতেই হইবে।"

বরযাত্রগণ খেপিয়া উঠিয়া মহা হাঙ্গামা করিতে লাগিল। কহিল, "আমরা স্টেশনে গিয়া ট্রেন ধরিয়া এখনই বাড়ি ফিরিয়া যাই।"

যজ্ঞেশ্বর হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "একেবারে উপবাস নয়। শিবতলার ছানা বিখ্যাত। উপযুক্ত পরিমাণে ছানা কদমা সংগ্রহ আছে। আমার অন্তরের মধ্যে যাহা হইতেছে তাহা অন্তর্যামীই জানেন।"

যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতি দেখিয়া বাথানপাড়ার গোয়ালারা বলিয়াছিল, "ভয় কী ঠাকুর, ছানা যিনি যত খাইতে পারেন আমরা যোগাইয়া দিব।" বিদেশের বরযাত্রগণ না খাইয়া ফিরিলে শিবতলা গ্রামের অপমান, সেই অপমান ঠেকাইবার জন্য গোয়ালারা প্রচুর ছানার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

বরযাত্রগণ পরামর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যত আবশ্যক ছানা যোগাইতে পারিবে তো ?"

যজ্ঞেশ্বর কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কহিল, "তা পারিব ।"

"আচ্ছা, তবে আনো" বলিয়া বরযাত্রগণ বসিয়া গেল। গৌরসুন্দর বসিলেন না, তিনি নীরবে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

আহারস্থানের চারি দিকেই পুষ্করিণী ভরিয়া উঠিয়া জলে কাদায় একাকার হইয়া গেছে। যজ্ঞেশ্বর যেমন-যেমন পাতে ছানা দিয়া যাইতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ বরযাত্রগণ তাহা কাঁধ ডিঙাইয়া পশ্চাতে কাদার মধ্যে টপ্ টপ্ করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

উপায়বিহীন যজ্ঞেশ্বরের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। বারম্বার সকলের কাছে জোড়হাত করিতে লাগিলেন ; কহিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আপনাদের নির্যাতনের যোগ্য নই ।"

একজন শুষ্কহাস্য হাসিয়া উত্তর করিল, "মেয়ের বাপ তো বটেন, সে অপরাধ যায় কোথায় ?" যজ্ঞেশ্বরের স্বগ্রামের বৃদ্ধগণ বারবার ধিক্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার যেমন অবস্থা সেইমতো ঘরে কন্যাদান করিলেই এ দুর্গতি ঘটিত না ।"

এ দিকে অন্তঃপুরে মেয়ের দিদিমা অকল্যাণ-শঙ্কা সত্ত্বেও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মেয়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরের জেঠাইমা আসিয়া বিভূতিকে কহিলেন, "ভাই, অপরাধ যা হইবার তা তো

হইয়াই গেছে— এখন মাপ করো, আজিকার মতো শুভকর্ম সম্পন্ন হইতে দাও।"

এদিকে ছানার অন্যায় অপব্যয় দেখিয়া গোয়ালার দল রাগিয়া হাঙ্গাম করিতে উদ্যত। পাছে বরযাত্রদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায়, এই আশঙ্কায় যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভোজনশালায় অসময়ে বর আসিয়া উপস্থিত। বরযাত্রা ভাবিল, বর বুঝি রাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে— তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল।

বিভূতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "বাবা, আমাদের এ কিরকম ব্যবহার!" বলিয়া একটা ছানার থালা লইয়া স্বহস্তে পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইল। গোয়ালাদিগকে বলিল, "তোমরা পশ্চাৎ দাঁড়াও, কাহারও ছানা যদি পাঁকে পড়ে তো পাতে তুলিয়া দিতে হইবে।"

গৌরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া দুই-একজন উঠিবে কি না ইতস্তত করিতেছিল। বিভূতি কহিল, "বাবা, তুমিও বসিয়া যাও, অনেক রাত হইয়াছে।"

গৌরসুন্দর বসিয়া গেলেন। ছানা যথাস্থানে পৌঁছিতে লাগিল।

বিলাত

একবার শীতের সময় আমি টনব্রিজ ওয়েল্‌স্‌ শহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে ; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই, বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোনো কথা বলিল না, কেবল মুহূর্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছু দূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মহাশয়, আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন।" বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। এই ঘটনাটি হয়তো আমার মনে থাকিত না, কিন্তু ইহার অনুরূপ আর-একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধ করি টর্কি স্টেশনে প্রথম যখন পৌঁছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকাগাড়িতে তুলিয়া দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনিজাতীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্ধক্রাউন ছিল, সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্বোধ বিদেশী ঠাওরাইয়া আরও-কিছু দাবি করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, "আপনি বোধ করি পেনি মনে করিয়া আমাকে অর্ধক্রাউন দিয়াছেন।"

যতদিন ইংলণ্ডে ছিলাম কেহ আমাকে বঞ্চনা করে নাই তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাখিবার বিষয় নহে এবং তাহাকে বড়ো করিয়া দেখিলে অবিচার করা হইবে। আমার মনে এই কথাটা খুব লাগিয়াছে যে, যাহারা নিজে বিশ্বাস নষ্ট করে না তাহারাই অন্যকে বিশ্বাস করে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশী অপরিচিত, যখন খুশি ফাঁকি দিয়া দৌড় মারিতে পারি, তবু সেখানে দোকানে বাজারে কেহ আমাদিগকে কিছু সন্দেহ করে নাই।

যতদিন বিলাতে ছিলাম, শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একটি প্রহসন আমার প্রবাসবাসের সঙ্গে জড়িত হইয়া ছিল। ভারতবর্ষের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি স্নেহ করিয়া আমাকে রুবি বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যু-উপলক্ষে তাঁহার ভারতবর্ষীয় এক বন্ধু ইংরেজিতে একটি বিলাপগান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভাষানৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কবিতাটি বেহাগ-রাগিণীতে গাহিতে হইবে এমন একটা উল্লেখ ছিল। আমাকে একদিন তিনি ধরিলেন, "এই গানটা তুমি বেহাগ-রাগিণীতে গাহিয়া আমাকে শুনাও।" আমি নিতান্ত ভালোমানুষি করিয়া তাঁহার কথাটা রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই অদ্ভুত কবিতার সঙ্গে বেহাগ-সুরের সম্মিলনটা যে কিরূপ হাস্যকর হইয়াছিল তাহা আমি ছাড়া বুঝিবার দ্বিতীয় কোনো

লোক সেখানে উপস্থিত ছিল না। মহিলাটি ভারতবর্ষীয় সুরে তাঁহার স্বামীর শোকগাথা শুনিয়া খুব খুশি হইলেন। আমি মনে করিলাম, এইখানেই পালা শেষ হইল ; কিন্তু হইল না।

সেই বিধবা রমণীর সঙ্গে নিমন্ত্রণসভায় প্রায়ই আমার দেখা হইত। আহারান্তে বৈঠকখানাঘরে যখন নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্রে সমবেত হইতেন তখন তিনি আমাকে সেই বেহাগ গান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। অন্য সকলে ভাবিতেন, ভারতবর্ষীয় সংগীতের একটা বুঝি আশ্চর্য নমুনা শুনিতে পাইবেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া সানুনয় অনুরোধে যোগ দিতেন, মহিলাটির পকেট হইতে সেই ছাপানো কাগজখানি বাহির হইত— আমার কর্ণমূল রক্তিম আভা ধারণ করিত। নতশিরে লজ্জিতকণ্ঠে গান ধরিতাম ; স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম, এই শোকগাথার ফল আমার পক্ষে ছাড়া আর-কাহারও পক্ষে যথেষ্ট শোচনীয় হইত না। গানের শেষে চাপা হাসির মধ্য হইতে শুনিতে পাইতাম : Thank you very much. How interesting! তখন শীতের মধ্যেও আমার শরীর ঘর্মাক্ত হইবার উপক্রম করিত। এই ভদ্রলোকের মৃত্যু আমার পক্ষে যে এতবড়ো একটা দুর্ঘটনা হইয়া উঠিবে তাহা আমার জন্মকালে বা তাঁহার মৃত্যুকালে কে মনে করিতে পারিত!

তাহার পর আমি যখন ডাক্তার স্কটের বাড়িতে থাকিয়া লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে পড়া আরম্ভ করিলাম তখন কিছুদিন সেই মহিলাটির সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল ; লণ্ডনের বাহিরে

কিছু দূরে তাঁহার বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে যাইবার জন্য তিনি প্রায় আমাকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিতেন। আমি শোক-গাথার ভয়ে কোনোমতেই রাজি হইতাম না। অবশেষে একদিন তাঁহার সানুনয় একটি টেলিগ্রাম পাইলাম। টেলিগ্রাম যখন পাইলাম তখন কলেজে যাইতেছি। এ দিকে তখন কলিকাতায় ফিরিবার সময়ও আসন্ন হইয়াছে। মনে করিলাম, এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে বিধবার অনুরোধটা পালন করিয়া যাইব। কলেজ হইতে বাড়ি না গিয়া একেবারে স্টেশনে গেলাম। সেদিন বড়ো দুর্যোগ। খুব শীত, বরফ পড়িতেছে, কুয়াশায় আকাশ আচ্ছন্ন। যেখানে যাইতে হইবে সেই স্টেশনেই এ লাইনের শেষ গম্যস্থান, তাই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। কখন গাড়ি হইতে নামিতে হইবে তাহা সন্ধান লইবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

দেখিলাম, স্টেশনগুলি সব ডান দিকে আসিতেছে। তাই ডান দিকের জানলা ঘেঁষিয়া বসিয়া গাড়ির দীপালোকে একটা বই পড়িতে লাগিলাম। সকাল সকাল সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, বাহিরে কিছুই দেখা যায় না। লণ্ডন হইতে যে কয়জন যাত্রী আসিয়াছিল তাহারা নিজ নিজ গম্যস্থানে একে একে নামিয়া গেল।

গন্তব্য স্টেশনের পূর্ব-স্টেশন ছাড়িয়া গাড়ি চলিল। এক জায়গায় একবার গাড়ি থামিল। জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সমস্ত অন্ধকার। লোকজন নাই, আলো নাই,

প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌ নাই, কিছুই নাই। ভিতরে যাহারা থাকে তাহারাই প্রকৃত তত্ত্ব জানা হইতে বঞ্চিত— রেলগাড়ি কেন যে অস্থানে অসময়ে থামিয়া বসিয়া থাকে রেলের আরোহীদের তাহা বুঝিবার উপায় নাই, অতএব পুনরায় পড়ায় মন দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি পিছু হটিতে লাগিল— মনে ঠিক করিলাম, রেলগাড়ির চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করা মিথ্যা। কিন্তু যখন দেখিলাম, যে স্টেশনটি ছাড়িয়া গিয়াছিলাম সেই স্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল, তখন উদাসীন থাকা আমার পক্ষে কঠিন হইল। স্টেশনের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, অমুক স্টেশন কখন পাওয়া যাইবে? সে কহিল, সেইখান হইতেই তো এ গাড়ি এইমাত্র আসিয়াছে। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাইতেছে? সে কহিল, লণ্ডনে। বুঝিলাম, এ গাড়ি খেয়াগাড়ি, পারাপার করে। ব্যতিব্যস্ত হইয়া হঠাৎ সেইখানে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরের গাড়ি কখন পাওয়া যাইবে? সে কহিল, আজ রাত্রে নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছাকাছির মধ্যে সরাই কোথাও আছে? সে বলিল, পাঁচ মাইলের মধ্যে না।

প্রাতে দশটার সময় আহার করিয়া বাহির হইয়াছি, ইতিমধ্যে জলস্পর্শ করি নাই। কিন্তু বৈরাগ্য ছাড়া যখন দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে তখন নিবৃত্তিই সব-চেয়ে সোজা। মোটা ওভারকোটের বোতাম গলা পর্যন্ত আঁটিয়া স্টেশনের দীপস্তম্ভের নীচে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম।

বইটা ছিল স্পেন্সরের Data of Ethics, সেটি তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত্যন্তর যখন নাই তখন, এইজাতীয় বই মনোযোগ দিয়া পড়িবার এমন পরিপূর্ণ অবকাশ আর জুটিবে না, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

কিছুকাল পরে পোর্টার আসিয়া কহিল, আজ একটি স্পেশাল আছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। শুনিয়া মনে এত স্ফূর্তির সঞ্চার হইল যে, তাহার পর হইতে Data of Ethics-এ মনোযোগ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

সাতটার সময় যেখানে পৌঁছিবার কথা সেখানে পৌঁছিতে সাড়ে নয়টা হইল। গৃহকর্ত্রী কহিলেন, "এ কী রুবি! ব্যাপার-খানা কী?" আমি আমার আশ্চর্য ভ্রমণবৃত্তান্তটি খুব যে সগর্বে বলিলাম তাহা নয়।

তখন সেখানকার নিমন্ত্রিতগণ ডিনার শেষ করিয়াছেন। আমার মনে ধারণা ছিল যে, আমার অপরাধ যখন স্বেচ্ছাকৃত নহে তখন গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে না— বিশেষত রমণী যখন বিধানকর্ত্রী। কিন্তু উচ্চপদস্থ ভারত-কর্মচারীর বিধবা স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "এসো রুবি, এক পেয়ালা চা খাইবে।"

আমি কোনোদিন চা খাই না, কিন্তু জঠরানল নির্বাপণের পক্ষে পেয়ালা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে মনে করিয়া গোটাদুয়েক চক্রাকার বিস্কুটের সঙ্গে সেই কড়া চা গিলিয়া ফেলিলাম। বৈঠকখানাঘরে আসিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি প্রাচীনা নারীর সমাগম হইয়াছে। ঘরের গৃহিণী বলিলেন,

এবার তবে নৃত্য শুরু করা যাক। আমার নৃত্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না, এবং শরীর-মনের অবস্থাও নৃত্যের অনুকূল ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত ভালোমানুষ যাহারা জগতে তাহারা অসাধ্য সাধন করে।

এইখানেই দুঃখের অবধি হইল না। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রুবি, আজ তুমি রাত্রিযাপন করিবে কোথায়?” এ প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি হতবুদ্ধি হইয়া যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম তিনি কহিলেন, “রাত্রি দ্বিপ্রহরে এখানকার সরাই বন্ধ হইয়া যায়; অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এখনই তোমার সেখানে যাওয়া কর্তব্য।” সৌজন্যের একেবারে অভাব ছিল না— সরাই আমাকে নিজে খুঁজিয়া লইতে হয় নাই। লণ্ঠন ধরিয়া একজন ভৃত্য আমাকে সরাইয়ে পৌঁছাইয়া দিল।

মনে করিলাম, হয়তো শাপে বর হইল, হয়তো এখানে আহারের ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমিষ হউক, নিরামিষ হউক, তাজা হউক, বাসি হউক, কিছু খাইতে পাইব কি? তাহারা কহিল, মদ্য যত চাও পাইবে, খাদ্য নয়। তখন ভাবিলাম, নিদ্রাদেবীর হৃদয় কোমল। তিনি আহার না দিন, বিস্মৃতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার জগৎজোড়া অঙ্কেও তিনি সে রাত্রে আমাকে স্থান দিলেন না। বেলে পাথরের মেজে-ওয়ালা ঘর ঠাণ্ডা কন্ কন্ করিতেছে; একটি পুরাতন খাট ও একটি জীর্ণ মুখ-ধুইবার টেবিল ঘরের আসবাব।

সকালবেলায় ইঙ্গ-ভারতী বিধবাটি প্রাতরাশ খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজি দস্তুরে যাহাকে ঠাণ্ডা খানা বলে তাহারই আয়োজন। অর্থাৎ গতরাত্রির ভোজের অবশেষ আজ ঠাণ্ডা অবস্থায় খাওয়া গেল। ইহারই অতি যৎসামান্য কিছু অংশ যদি উষ্ণ বা কবোষ্ণ আকারে কাল পাওয়া যাইত তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারও কোনো গুরুতর ক্ষতি হইত না— অথচ আমার নৃত্যটা ডাঙায়-তোলা কইমাছের নৃত্যের মতো এমন শোকাবহ হইতে পারিত না।

আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, “যাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি তিনি অসুস্থ, শয্যাগত; তাঁহার শয়নগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে গাহিতে হইবে।” সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। রুদ্ধ দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গৃহিণী কহিলেন, “ওই ঘরে তিনি আছেন।” আমি সেই অদৃশ্য রহস্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগ-রাগিণীতে গাহিলাম, তাহার পর রোগিণীর অবস্থা কী হইল সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পাই নাই।

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া দুই-তিন দিন বিছানায় পড়িয়া নিরঙ্কুশ ভালোমানুষির প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ডাক্তারের মেয়েরা কহিলেন, “দোহাই তোমার, এ নিমন্ত্রণ-ব্যাপারকে আমাদের দেশের আতিথ্যের নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিয়ো না। এ তোমাদের ভারতবর্ষের নিমকের গুণ।”

লামার প্রাণদণ্ড

তিব্বতে অবস্থিতিকালে রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাত্বর যে লামার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তিব্বত-গবর্মেণ্ট তাঁহাকে কিরূপ দণ্ড দিয়াছিল তাহার বিবরণ জাপানী বৌদ্ধ পুরোহিত একাই কাওয়াগুচির 'তিব্বতে তিন বৎসর' নামক ভ্রমণ-পুস্তকে বাহির হইয়াছে।

এই লামার নাম সেঙ্‌চেন দর্‌জেচান। ইনি মহাজ্ঞানী ও ধার্মিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। রায় শরচ্চন্দ্র তিব্বত হইতে চলিয়া আসার পর যখন তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার সন্দেহের রটনা হইতে লাগিল তখনই লামা বুঝিয়াছিলেন, মৃত্যুর হাত হইতে তাঁহার আর অব্যাহতি নাই। শরচ্চন্দ্রের সহিত সংস্রব-বশতঃ তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা আছে এই কথা বন্ধুদের মুখ হইতে শুনিয়া লামা কহিলেন, কেবলমাত্র স্বদেশীর কাছে নহে, বিদেশীর কাছেও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা তাঁহার কর্তব্য। শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বতে ইংরেজের গুপ্তচর হইয়া আসিয়াছেন কি না সে কথা তাঁহার বিচার করিবার নহে এবং সে কথা তিনি চিন্তাও করেন নাই। তিনি তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়াছেন। সেজন্য যদি তাঁহাকে মৃত্যু স্বীকার করিতে হয় তাহাতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না।

এই লামা বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের জন্য বিশেষ উৎসাহশীল ছিলেন। ইনি অনেক বৌদ্ধমূর্তি ও পূজাপাত্র ভারতবর্ষে

পাঠাইয়াছেন এবং অনেকগুলি প্রচারককেও এখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টার কোনো ফল হয় নাই। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার চরিত্র অতি মহৎ ছিল, তিনি সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও পরজাতিবিদ্বেষের অতীত ছিলেন এবং বৌদ্ধপন্থা অনুসরণ করিয়া সকল দেশের মানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ঐক্যবন্ধন বিস্তার করা তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। এইরূপ উদারবুদ্ধি সাধুকে সংকীর্ণমনা রাজকর্মচারীরা ভালোবাসিতে পারে না, এই কারণে উচ্চপদস্থ অনেক শত্রু তাঁহার পতনের সুযোগ খুঁজিতেছিল। রায় শরচ্চন্দ্র দাস সম্বন্ধীয় জনশ্রুতিকে তাহারা বৈরসাধনের উপায় করিয়া তুলিল। তাহারা দার্জিলিঙে লোক পাঠাইয়া খবর লইল যে, শরৎ দাস ইংরেজ গবর্মেণ্টের অনুরোধে ছদ্মভাবে তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছেন। রায় শরচ্চন্দ্রের সহিত তিব্বত-বাসী যে-কেহ লিপ্ত ছিল সকলেরই কারাদণ্ড হইল এবং লামা সেঙ্‌চেন দর্‌জেচান বিপক্ষ-গবর্মেণ্টের গুপ্তচরকে ধর্মমন্দিরে আশ্রয় দিয়া তাঁহার নিকট রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন এই অপরাধে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইল। কন্‌বো নদীতে তাঁহাকে ডুবাইয়া মারা স্থির হইল। এই 'কন্‌বো' ব্রহ্মপুত্রের নামান্তর। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই দণ্ড কার্যে পরিণত হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে নদীতীরে একটি শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া লামা সমাহিতচিত্তে ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। তাঁহার চারি দিকে লোকের ভিড়,

তাহারা সকলেই শোকে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতেছে। যে মোটা দড়ি দিয়া তাঁহাকে জলে নামাইতে হইবে তদ্দারা তাঁহার দেহ বেষ্টন করিবার সময় ঘাতক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মৃত্যুর পূর্বে তিনি কী ইচ্ছা করেন। তদুত্তরে লামা কহিলেন, গ্রন্থপাঠ সমাধা করিয়া যখন তিনি তিনবার অঙ্গুলি দ্বারা সংকেত করিবেন তখনই যেন তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করা হয়। ইতিমধ্যে সমাগত জনবৃন্দের হৃদয় ব্যাকুল হইতে লাগিল; তাহারা ব্রহ্মপুত্রের নিষ্ঠুর খরস্রোতের দিকে তাকাইয়া আছে এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া বিলাপ করিয়া উঠিতেছে। সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। লামা তাঁহার হাত একবার তুলিলেন। এই সংকেতের নিদারুণ অর্থ বুঝিয়া লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। লামা একবার, দুইবার, তিনবার সংকেত করিলেন। কিন্তু কেহই নিকটে আসে না— ঘাতকেরাও তখন কাঁদিতেছে। লামা কহিলেন, "আমার সময় আসিয়াছে, তোমরা আর বিলম্ব করিয়ো না।" তখন তাঁহার কটিদেশে ভারি পাথর বাঁধিয়া দিয়া ঘাতকেরা তাঁহাকে ধীরে ধীরে উন্মত্ত জলরাশির মধ্যে নামাইয়া দিল। এতক্ষণে মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া যখন তাঁহাকে টানিয়া তুলিল দেখিল, তখনও তাঁহার প্রাণ যায় নাই। পুনর্বার তাঁহাকে জলে নামাইতে হইল। দ্বিতীয়বার যখন তুলিল তখনও তাঁহার প্রাণ আছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য সকলেই একবাক্যে অনুরোধ করিতে লাগিল— ঘাতকেরাও

দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। এমন সময়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লামা সংজ্ঞা লাভ করিলেন, এবং কহিলেন, "শোক করিয়ো না, আমার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, আমি আনন্দেই মরিতেছি; তোমরা আমাকে মারিতেছ না। এখন আমার কামনা এই যে, আমার মৃত্যুর পরে তিব্বতে ধর্ম যেন উন্নতি লাভ করে। ত্বরা করো, আমাকে জলে নামাইয়া দাও।"

তৃতীয়বার যখন তাঁহাকে জল হইতে তোলা হইল তখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

মানুষ-সৃষ্টি

প্রাচীনকালে একসময় পৃথিবীতে কোনো জীবজন্তু ছিল না। কেবল একটি পুষ্করিণীতে একটি বড়োগোছের ব্যাঙ ছিল, আর আকাশে ছিল চাঁদ ; উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলিত।

একদিন চাঁদ বলিল, "দেখো ব্যাঙ, মনে করিতেছি, পৃথিবীর ফল শস্য ভোগ করিবার জন্য আমি একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রী সৃজন করিব।"

ব্যাঙ বলিল, "আমি পৃথিবীতে থাকি, পৃথিবীর প্রাণী আমিই ভালোরূপ গড়িতে পারিব, অতএব সে ভার আমি লইলাম।"

চাঁদ কহিল, "আমি যাহাদের সৃজন করিব তাহারা অমর হইবে, তোমার সে ক্ষমতা নাই।"

ব্যাঙ কহিল, "ভাই, তোমার আকাশ লইয়া তুমি থাকো-না, এ পৃথিবীর জীবসৃষ্টি আমারই কর্তব্য কার্য।"

অতঃপর ব্যাঙ ভাবাবেশে ক্রমশ স্ফীত হইয়া একজোড়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত নরনারীর জন্মদান করিল।

চাঁদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "এ কী কাণ্ড করিয়াছ! এই-যে দুটো জীবকে জন্ম দিয়াছ, ইহাদের না আছে বুদ্ধি, না আছে আত্মরক্ষার ক্ষমতা, না আছে দীর্ঘ জীবন। বেচারাদের প্রতি দয়া করিয়া আমি যতটা পারি সংশোধন করিয়া লইব। উহাদিগকে কিছু বুদ্ধি দিব এবং আয়ুও বাড়াইয়া দিব, কিন্তু তোমাকে আর রাখিতেছি না।"

এই বলিয়া অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়া ব্যাঙটাকে চাঁদ দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

অতঃপর ভীত লুক্কায়িত মানুষদুটাকে ধরিয়া তাহাদিগকে স্নান করাইয়া দিয়া ইতস্তত টিপিয়া-টুপিয়া তাহাদের শরীরের গড়ন কতকটা দুরস্ত করিয়া লইল। পুরুষের নাম দিল বাটেটা এবং মেয়ের নাম দিল হানা। অবশেষে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দেখো, তৃণ লতা গুল্ম সবই তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের জন্য। তোমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছি, অতএব ইহার মধ্য হইতে তোমরা নিজের ভালোমন্দ বাছিয়া লইবে। এই লও একটি কুঠার। তোমাদের জন্য আমি এই আগুন করিয়া দিলাম, ইহাকে রক্ষা করিবে, এবং কেমন করিয়া আহারের পাত্র গড়িতে হয় দেখাইয়া দিতেছি, শিখিয়া লও।"

এই শিক্ষা দিয়া, রাঁধিয়া খাইবার উপদেশ দিয়া চাঁদ আকাশে চড়িলেন এবং প্রসন্ন হাস্যের সহিত ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

তখন এই নরনারী চন্দ্রালোকে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি তরুকোটর দেখিয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল।

মাসখানেকের মধ্যেই হানা একটি যমজ পুত্রকন্যাকে জন্ম দিল। বাটেটা বড়ো খুশি হইয়া তাহার স্ত্রীর সেবা করিতে লাগিল এবং তাহার জন্য উত্তম সুখাদ্য সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই প্রসূতির রুচিকর বোধ হয় না। তখন চাঁদের দিকে হাত তুলিয়া কহিল, "হে চাঁদ, আমি তো আমার

স্ত্রীর পছন্দমতো কোনো খাদ্যই খুঁজিয়া পাই না। একটা উপায় বলিয়া দাও।"

চাঁদ নামিয়া আসিয়া বাটেটার হাতে একছড়া কলা দিয়া কহিল, "দেখো দেখি, ইহার গন্ধটা কেমন লাগে।"

বাটেটা কহিল, "বাঃ! অতি চমৎকার।"

তখন চাঁদ একটির খোসা ছাড়াইয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, "খাইয়া দেখো দেখি, কেমন বোধ হয়।"

সে খাইয়া মহাখুশি হইয়া স্ত্রীর জন্য লইয়া গেল। স্ত্রীও বড়ো পরিতোষ লাভ করিল। কহিল, "জিনিসটি অতি উত্তম, কিন্তু ইহাতে শরীরে বল পাইতেছি না।"

বাটেটা চাঁদকে সে কথা জানাইল। চাঁদ কহিল, "দেখো দেখি, ওই কী যায়।"

বাটেটা কহিল, "ও তো মহিষ।"

চাঁদ বলিল, "ঠিক বলিয়াছ। উহার পশ্চাতে কী যায়?"

বাটেটা কহিল, "ছাগল।"

চাঁদ কহিল, "আচ্ছা। তাহার পশ্চাতে কী বলো দেখি।"

বাটেটা কহিল, "হরিণ।"

চাঁদ কহিল, "অতি উত্তম। তাহার পরে?"

বাটেটা। ভেড়া।

চাঁদ। ভেড়াই বটে। এখন আকাশে কী উড়িতেছে দেখো দেখি।

বাটেটা। মুরগী এবং পায়রা।

চাঁদ কহিল, "বেশ বলিয়াছ। তা, এইসমস্ত তোমাদিগকে দেওয়া গেল। ইহাদেরই মাংস রাঁধিয়া খাওয়াও।"

এইভাবে সময় যায়। আদি-দম্পতি হঠাৎ একদিন সকালে উঠিয়া দেখে, মস্ত একটা আগুনের চাকার মতো আকাশে উঠিয়া আলোকে চতুর্দিক উজ্জ্বল করিয়াছে। হানা কহিল, "বাটেটা, এ কী হইল ?"

বাটেটা কহিল, "চাঁদকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তো বলিতে পারি না।"

এই বলিয়া চাঁদকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। একটা বজ্রতুল্য স্বর আকাশ হইতে কহিল, "রোসো, আগে এই নূতন আলোটা নিবিয়া যাক, তার পরে কথাবার্তা হইবে।"

অন্ধকার হইলে চাঁদ উঠিয়া কহিল, "এখন হইতে সময় দিন এবং রাত্রে ভাগ হইবে। সকালে সূর্য, এবং রাত্রে আমি ও আমার সন্তান নক্ষত্রগণ আলো দিব। এ নিয়মের কোনো-কালে লঙ্ঘন হইবে না। যেহেতু তোমরা সর্বপ্রথম প্রাণী, তোমাদের সন্তানেরা জীবরাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে। তোমাদিগকে আমি পরিপূর্ণতা এবং অনন্ত জীবন দান করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই ব্যাঙটার জন্মদোষ তোমাদের শরীরে রহিয়া গেছে; অতএব মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে না।" অবশেষে কহিল, "যে পর্যন্ত তুমি এবং হানা পৃথিবীতে থাকিবে আমি আবশ্যক-মতো তোমাদের সাহায্য ও পরামর্শ দিতে ত্রুটি করিব না, কিন্তু তোমাদের অবর্তমানে মানুষের সহিত আলাপ-পরিচয় আর চলিবে না। অতএব তোমরা যাহা-কিছু শিখিবে সন্তানদের শিখাইয়া দিয়ো।"

বিল্বন ঠাকুর

নোয়াখালির নিজামৎপুরে বিল্বন ঠাকুর কিছুদিন হইতে বাস করিতেছেন। সেখানে ভয়ংকর মড়কের প্রাতুর্ভাব হইয়াছে।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি একদিন সমস্ত দিন মেঘ করিয়া থাকে, মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টিও হয়। অবশেষে সন্ধ্যার সময় রীতিমতো ঝড় আরম্ভ হয়। প্রথমে পূর্বদিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় উত্তর ও উত্তর-পূর্ব হইতে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। অবশেষে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ঝড়ের বেগ কমিয়া গেল। এমন সময়ে রব উঠিল, বন্যা আসিতেছে। কেহ ঘরের চালে উঠিল, কেহ পুষ্করিণীর পাড়ের উপর গিয়া দাঁড়াইল, কেহ বৃক্ষশাখায় কেহ মন্দিরের চূড়ায় আশ্রয় লইল। অন্ধকার রাত্রি, অবিশ্রাম বৃষ্টি— বন্যার গর্জন ক্রমে নিকটবর্তী হইল, আতঙ্কে গ্রামের লোকেরা দিশাহারা হইয়া গেল। এমন সময়ে বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরি-উপরি তুইবার তরঙ্গ আসিল, দ্বিতীয়বারের পরে গ্রামে প্রায় আট হাত জল দাঁড়াইল। পরদিন যখন সূর্য উঠিল এবং জল নামিয়া গেল তখন দেখা গেল— গ্রামে গৃহ অল্পই অবশিষ্ট আছে, এবং লোক নাই ; অন্য গ্রাম হইতে মানুষ গোরু মহিষ ছাগল এবং শৃগাল-কুকুরের মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছে। সুপারির গাছগুলা ভাঙিয়া ভাসিয়া গেছে, গুঁড়ির কিয়দংশ মাত্র

অবশিষ্ট আছে। বড়ো বড়ো আম-কাঁঠালের গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া কাত হইয়া পড়িয়া আছে। অন্য গ্রামের গৃহের চাল ভাসিয়া আসিয়া ভিত্তির শোকে ইতস্তত উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকগুলো হাঁড়ি-কলসী বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। অধিকাংশ কুটিরই বাঁশঝাড় আম কাঁঠাল মাদার প্রভৃতি বড়ো বড়ো গাছের দ্বারা আবৃত ছিল, এইজন্য অনেকগুলি মানুষ একেবারে ভাসিয়া না গিয়া গাছে আটকাইয়া গিয়াছিল। কেহ-বা সমস্ত রাত্রি বন্যাবেগে দোদুল্যমান বাঁশঝাড়ে দুলিয়াছে, কেহ-বা মাদারের কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত, কেহ-বা উৎপাটিত বৃক্ষ-সমেত ভাসিয়া গেছে। জল সরিয়া গেলে জীবিত ব্যক্তিরা নামিয়া আসিয়া মৃতের মধ্যে বিচরণ করিয়া আত্মীয়দিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অধিকাংশ মৃতদেহই অপরিচিত এবং ভিন্ন গ্রাম হইতে আগত। কেহই তাহাদিগকে সৎকার করিল না। পালে পালে শকুনি আসিয়া মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শৃগাল-কুকুরের সহিত তাহাদের কোনো বিবাদ নাই, কারণ শৃগাল-কুকুরও সমস্ত মরিয়া গিয়াছে। বারো ঘর পাঠান গ্রামে বাস করিত; তাহারা অনেক উচ্চ জমিতে বাস করিত বলিয়া তাহাদের প্রায় কাহারও কোনো ক্ষতি হয় নাই। অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা গৃহ পাইল তাহারা গৃহে আশ্রয় লইল, যাহারা পাইল না তাহারা আশ্রয়-অন্বেষণে অন্যত্র গেল। যাহারা বিদেশে ছিল তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া নূতন গৃহ নির্মাণ করিল। ক্রমে অল্পে অল্পে পুনশ্চ লোকের

বসতি আরম্ভ হইল। এই সময়ে মৃতদেহে পুষ্করিণীর জল দূষিত হইয়া, এবং অন্যান্য নানা কারণে গ্রামে মড়ক আরম্ভ হইল। পাঠানদের পাড়ায় মড়কের প্রথম আরম্ভ হইল। মৃতদেহের গোর দিবার বা পরস্পরকে সেবা করিবার অবসর কাহারও রহিল না। হিন্দুরা কহিল, মুসলমানেরা গোহত্যা-পাপের ফল ভোগ করিতেছে। জাতিবৈরিতায় এবং জাতিচ্যুতিভয়ে কোনো হিন্দু তাহাদিগকে জল দিল না বা কোনোপ্রকার সাহায্য করিল না।

বিল্বন ঠাকুর যখন গ্রামে আসিলেন তখন গ্রামের এইরূপ অবস্থা। বিল্বনের কতকগুলি চেলা জুটিয়াছিল, মড়কের ভয়ে তাহারা পালাইবার চেষ্টা করিল। বিল্বন ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে বিরত করিলেন। তিনি পীড়িত পাঠানদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে পথ্য পানীয় ঔষধ এবং তাহাদের মৃতদেহ গোর দিতে লাগিলেন। হিন্দুরা হিন্দু সন্ন্যাসীর অনাচার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। বিল্বন কহিতেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমার কোনো জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত! ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত!" হিন্দুরা বিল্বনের অনাসক্ত পরহিতৈষণা দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে যেন সাহস করিল না। বিল্বনের কাজ ভালো কি মন্দ তাহারা স্থির করিতে পারিল না। তাহাদের অসম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান সন্দিগ্ধভাবে বলিল 'ভালো নহে',

কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের ভিতরে যে মনুষ্য বাস করিতেছে সে বলিল 'ভালো'। যাহা হউক, বিল্বন অন্যের ভালোমন্দ-বিচারের দিকে না তাকাইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু পাঠানেরা তাঁহাকে দেবতাজ্ঞান করিতে লাগিল। পাঠানের ছোটো ছোটো ছেলেদের তিনি মড়ক হইতে দূরে রাখিবার জন্য হিন্দুদের কাছে লইয়া গেলেন। হিন্দুরা বিষম শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, কেহ তাহাদিগকে আশ্রয় দিল না। তখন বিল্বন একটা বড়ো পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ছেলের পাল সেইখানে রাখিলেন। প্রাতে উঠিয়া বিল্বন তাঁহার ছেলেদের জন্য ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন। কিন্তু ভিক্ষা কে দিবে! দেশে শস্য কোথায়! অনাহারে কত লোক মরিবার উপক্রম করিতেছে। গ্রামের মুসলমান জমিদার অনেক দূরে বাস করিতেন। বিল্বন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বহু কষ্টে তাঁহাকে রাজি করাইয়া তিনি ঢাকা হইতে চাউল আমদানি করিতে লাগিলেন। তিনি পীড়িতদের সেবা করিতেন এবং তাঁহার চেলারা চাউল বিতরণ করিত। মাঝে মাঝে বিল্বন ছেলেদের সঙ্গে গিয়া খেলা করিতেন। তাহারা তাঁহাকে দেখিলে তুমুল কোলাহল উত্থাপন করিত— সন্ধ্যার সময় মন্দিরের পাশ দিয়া গেলে মনে হইত, যেন মন্দিরে সহস্র টিয়াপাখি বাসা করিয়াছে। বিল্বনের এস্রাজের আকারের একপ্রকার যন্ত্র ছিল, যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইতেন তখন তাহাই বাজাইয়া গান করিতেন। ছেলেগুলো তাঁহাকে ঘিরিয়া কেহ-বা গান শুনিত,

কেহ-বা যন্ত্রের তার টানিত, কেহ-বা তাঁহার অনুকরণে গান করিবার চেষ্টা করিয়া বিষম চীৎকার করিত।

অবশেষে মড়ক মুসলমানপাড়া হইতে হিন্দুপাড়ায় আসিল। গ্রামে একপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইল— চুরিডাকাতির শেষ নাই, যে যাহা পায় লুট করিয়া লয়। মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া ডাকাতি আরম্ভ করিল। তাহারা পীড়িতদিগকে শয্যা হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া, তক্তা মাতুর বিছানা পর্যন্ত হরণ করিয়া লইয়া যাইত। বিল্বন প্রাণপণে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বিল্বনের কথা তাহারা অত্যন্ত মান্য করিত, লঙ্ঘন করিতে সাহস করিত না। এইরূপে বিল্বন যথাসাধ্য গ্রামের শান্তি রক্ষা করিতেন।

একদিন সকালে বিল্বনের এক চেলা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, একটি ছেলে সঙ্গে লইয়া একজন বিদেশী গ্রামের অশথতলায় আশ্রয় লইয়াছে, তাহাকে মড়কে ধরিয়াছে, বোধ করি সে আর বাঁচিবে না। বিল্বন দেখিলেন, কেদারেশ্বর অচেতন হইয়া পড়িয়া, ধ্রুব ধুলায় শুইয়া ঘুমাইয়া আছে। কেদারেশ্বরের মুমূর্ষু অবস্থা— পথকষ্টে এবং অনাহারে সে দুর্বল হইয়াছিল, এইজন্য পীড়া তাহাকে বলপূর্বক আক্রমণ করিয়াছে, কোনো ঔষধে কিছু ফল হইল না, সেই বৃক্ষতলেই তাহার মৃত্যু হইল। ধ্রুবকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন বহুক্ষণ অনাহারে ক্ষুধায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিল্বন অতি সাবধানে তাহাকে কোলে তুলিয়া তাঁহার শিশুশালায় লইয়া গেলেন।

চিৎপুরে সকালবেলা

সকালবেলায় কলিকাতার রাস্তা যে বিশেষ সুদৃশ্য তাহা নহে, বিশেষতঃ চিৎপুর রোড। সকালবেলাকার প্রথম সূর্যকিরণ পড়িয়াছে শ্যাকরা গাড়ির আস্তাবলের মাথায়, আর একসার বেলোয়ারি ঝাড়ওয়ালা মুসলমানদের দোকানের উপর। গ্যাসল্যাম্প্ গুলোর গায়ে সূর্যের আলো এমনি ঝিকমিক্ করিতেছে, সে দিকে চাহিবার জো নাই। সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের অভিনয় করিয়া তাহাদের সাধ মেটে নাই, তাই সকালবেলায় লক্ষ যোজন দূর হইতে সূর্যকে মুখ ভেঙাইয়া অতিশয় চক্চকে মহত্ত্বলাভের চেষ্টায় আছে। ট্রামগাড়ি শিস দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু এখনও যাত্রী বেশি জোটে নাই। ম্যুনিসি-পালিটির শকট কলিকাতার আবর্জনা বহন করিয়া অত্যন্ত মন্থর হইয়া চলিয়া যাইতেছে। ফুট্পাথের পার্শ্বে সারি সারি শ্যাক্‌রা গাড়ি আরোহীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া; সেই অবসরে অশ্বচর্মাবৃত চতুষ্পদ কঙ্কালগুলা ঘাড় হেঁট করিয়া অত্যন্ত শুকনো ঘাসের আঁটি অন্যমনস্কভাবে চিবাইতেছে; তাহাদের সেই পারমার্থিক ভাব দেখিলে মনে হয় যে, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহারা তাহাদের সম্মুখস্থ ঘাসের আঁটির সঙ্গে সমস্ত জগৎ-সংসারের তুলনা করিয়া সারবত্তা ও সরসতা সম্বন্ধে কোনো প্রভেদ দেখিতে পায় নাই। দক্ষিণে মুসলমানের দোকানের হৃতচর্ম খাসির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কতক দড়িতে ঝুলিতেছে, কতক খণ্ড

খণ্ড আকারে শলাকা আশ্রয় করিয়া অগ্নিশিখার উপরে ঘুর খাইতেছে, এবং বৃহৎকায় রক্তবর্ণ কেশবিহীন শ্মশ্রুলগণ বড়ো বড়ো হাতে মস্ত মস্ত রুটি সেঁকিয়া তুলিতেছে। কাবাবের দোকানের পাশে ফুঁকো ফানুষ-নির্মাণের জায়গা, অনেক ভোর হইতেই তাহাদের চুলায় আগুন জ্বালানো হইয়াছে। ঝাঁপ খুলিয়া কেহ-বা হাত মুখ ধুইতেছে, কেহ-বা দোকানের সম্মুখে ঝাঁট দিতেছে, দৈবাৎ কেহ-বা লাল-কলপ-দেওয়া দাড়ি লইয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একখানা ফার্সি কেতাব পড়িতেছে। সম্মুখে মসজিদ; একজন অন্ধ ভিক্ষুক মসজিদের সিঁড়ির উপরে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আমার উপনয়ন

আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার পিতা প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে তিনি কখনও হঠাৎ বাড়ি আসিতেন; সঙ্গে বিদেশী চাকর লইয়া আসিতেন; তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার জন্য আমার মনে ভারি ঔৎসুক্য হইত। একবার লেনু বলিয়া অল্পবয়স্ক একটি পাঞ্জাবি চাকর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আমাদের কাছে যে সমাদরটা পাইয়াছিল তাহা স্বয়ং রণজিতসিংহের পক্ষেও কম হইত না। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জাবি— ইহাতেই আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। পুরাণের ভীমার্জুনের প্রতি যেরকম শ্রদ্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবি জাতের প্রতিও মনে সেইপ্রকারের একটা সম্ভ্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা— ইহারা কোনো কোনো লড়াইয়ে হারিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকেও ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। সেই জাতের লেনুকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিয়াছিলাম। বউ-ঠাকুরানীর ঘরে একটা কাঁচাবরণে-ঢাকা খেলার জাহাজ ছিল, তাহাতে দম দিলেই রঙকরা কাপড়ের ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত এবং জাহাজটা আর্গিন-বাদ্যের সঙ্গে দুলিতে থাকিত। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এই আশ্চর্য সামগ্রীটি বউঠাকুরানীর

কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া প্রায় মাঝে মাঝে এই পাঞ্জাবিকে চমৎকৃত করিয়া দিতাম। ঘরের খাঁচায় বদ্ধ ছিলাম বলিয়া যাহা-কিছু বিদেশের, যাহা-কিছু দূর দেশের, তাহাই আমার মনকে অত্যন্ত টানিয়া লইত। তাই লেনুকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এই কারণেই গাব্রিয়েল বলিয়া একটি য়িহুদি তাহার ঘুন্টি-দেওয়া য়িহুদি পোশাক পরিয়া যখন আতর বেচিতে আসিত আমার মনে ভারি-একটা নাড়া দিত, এবং ঝোলাঝুলি-ওয়ালা ঢিলাঢালা-ময়লা-পায়জামা-পরা বিপুলকায় কাবুলি-ওয়ালাও আমার পক্ষে ভীতিমিশ্রিত রহস্যের সামগ্রী ছিল।

যাহা হউক, পিতা যখন আসিতেন আমরা কেবল আশপাশ হইতে দূরে তাঁহার চাকরবাকরদের মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌতূহল মিটাইতাম। তাঁহার কাছে পৌঁছানো ঘটিয়া উঠিত না।

বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো-এক সময়ে ইংরেজ গবর্মেণ্টের চিরন্তন জুজু রাশিয়ান কর্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন্-একটা ছিদ্রপথ দিয়া যে রুশীয়েরা ধূমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে তাহা তো বলা যায় না। এইজন্য মার মনে অত্যন্ত উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে

পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তালাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষ-কালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন, "রাশিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো।" মাতার উদ্‌বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয়, কিছুই জানি না। দফ্‌তরখানায় মহানন্দ মুন্‌শির শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাটাতে জমিদারি সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিতা লিখিয়াছিলেন— ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাশিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাশিয়ানভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না— কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর হইতে রোজই আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য মহানন্দের দফ্‌তরে হাজির হইতে লাগিলাম। বালকের উপদ্রবে অস্থির হইয়া কয়েক দিন মহানন্দ খসঁড়া করিয়া দিল। কিন্তু মাস্তুলের সংগতি তো নাই। মনে ধারণা ছিল, মহানন্দের হাতে চিঠি সমর্পণ করিয়া দিলেই বাকি দায়িত্বের কথা আমাকে আর চিন্তা করিতে হইবে না— চিঠি অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিবে। বলা বাহুল্য, মহানন্দের বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং ঐ চিঠিগুলি হিমাচলের শিখর পর্যন্ত পৌঁছে নাই।

বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্ গম্ করিতে থাকিত। দেখিতাম, গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া, তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোনো ত্রুটি হয় এই-জন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তক্‌মাওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি এজন্য পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।

একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিন জনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেক দিন ধরিয়া দালানে বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্ম-ধর্মগ্রন্থে সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধরীতিতে বারংবার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল। মাথা মুড়াইয়া বীর-বৌলি পরিয়া আমরা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম। সে আমাদের ভারি মজা লাগিল। পরস্পরের কানের কুণ্ডল ধরিয়া আমরা টানাটানি বাধাইয়া দিলাম।

একটা বাঁয়া ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল— বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম নীচের তলা দিয়া কোনো চাকর চলিয়া যাইতেছে ধপাধপ্ শব্দে আওয়াজ করিতে থাকিতাম— তাহারা উপরে মুখ তুলিয়াই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করিয়া অপরাধ-আশঙ্কায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইত। বস্তুতঃ, গুরু-গৃহে ঋষি বালকদের যে ভাবে কঠোর সংযমে দিন কাটাইবার কথা আমাদের ঠিক সে ভাবে দিন কাটে নাই। আমার বিশ্বাস, সাবেক কালের তপোবন অন্বেষণ করিলে আমাদের মতো ছেলে যে মিলিত না তাহা নহে; তাহারা খুব যে বেশি ভালোমানুষ ছিল তাহার প্রমাণ নাই। শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ-বারো ছিল তখন তাঁহারা কেবলই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতিদান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন এ কথা যদি কোনো পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই—কারণ শিশুচরিত্র-নামক পুরাণটি সকল পুরাণের অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মতো প্রামাণিক শাস্ত্র কোনো ভাষায় লিখিত হয় নাই।

নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে একমনে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম।

কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা— বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে জিনিসটা বাজিয়া উঠে, যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে সেটা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি। যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান তাঁহারা এই জিনিসটার কোনো খবর রাখেন না। আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব-একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়-দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না— তাঁহার আনন্দ-আবেগ-পূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ছেলেবেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছুই জানিতাম না তখন প্রচুর ছবি-ওয়ালা একখানি Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই— নিতান্ত আবছায়া-গোছের কী-একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা

রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম — পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার পক্ষে সে পড়া ততবড়ো শূন্য হয় নাই। একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতিপুরাতন ফোর্ট্ উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা ; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না ; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর-এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আর একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের—

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছু বুঝি নাই— কেবল “মন্দাকিনীনির্ঝর-শীকর” এবং “কম্পিতদেবদারু” এই দুইটি কথাই আমার মন

ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিতমহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগ-অন্বেষণ-তৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ূরপুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে, এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়োই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম।

নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভালো করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে, আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন— সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনোই সুস্পষ্ট বোঝে না, কিন্তু আভাসে পায়; এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমাখরচ খতাইয়া বিচার করেন তাঁহারাই অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন— যাহা দেওয়া গেল তাহা বুঝা গেল কি না। বালকেরা, এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে তাহারা, জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়— সেই স্বর্গ হইতে যখন পতন হয় তখন বুঝিয়া পাইবার দুঃখের দিন আসে। কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জগতে না-বুঝিয়া পাইবার রাস্তাই সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড়ো রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের

পাড়ায় হাটবাজার বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে না, পর্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।

তাই বলিতেছিলাম, গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু-একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার এক দিনের কথা মনে পড়ে— আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। অতএব কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মতো এমন কোনো-একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।

সুখ-দুঃখ

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা।
সকাল থেকে বাদল হল,
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুশি, যতই নেশা,
সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি—
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি
বাজে বাঁশি পাতার বাঁশি
আনন্দ-স্বরে—
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি,
সবার উপরে॥

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।

আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো,
ঐ-যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান-পানে চাহি—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে,
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ—
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ ॥

উৎসব

দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্‌ ডিম্‌ রবে,
সাঁওতালপল্লীতে উৎসব হবে।
পূর্ণিমাচন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়।
তালগাছে তালগাছে পল্লবচয়
চঞ্চল হিল্লোলে কল্লোলময়।
আম্রের মঞ্জরী গন্ধ বিলায়,
চম্পার সৌরভ শূন্যে মিলায়।
দান করে কুসুমিত কিংশুকবন
সাঁওতালকন্যার কর্ণভূষণ।
অতিদূর প্রান্তরে শৈলচূড়ায়
মেঘেরা চীনাংশুক-পতাকা উড়ায়।
ঐ শুনি পথে পথে হৈ হৈ ডাক,
বংশীর সুরে তালে বাজে ঢোল ঢাক।
নন্দিত কণ্ঠের হাস্যের রোল
অম্বরতলে দিল উল্লাসদোল॥

ধীরে ধীরে শর্বরী হয় অবসান,
উঠিল বিহঙ্গের প্রত্যুষগান।
বনচূড়া রঞ্জিল স্বর্ণলেখায়
পূর্ব দিগন্তের প্রান্তরেখায়॥

পণরক্ষা

"মারাঠা দস্যু আসিছে রে ওই,
করো করো সবে সাজ"
আজমীর-গড়ে কহিলা হাঁকিয়া
দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা দুপহরে যে যাহার ঘরে
সেঁকিছে জোয়ারি রুটি,
দুর্গতোরণে নাকাড়া বাজিতে
বাহিরে আসিল ছুটি।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া
দক্ষিণে বহু দূরে
আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধুলা
মারাঠী অশ্বখুরে।
"মারাঠার যত পতঙ্গপাল
কৃপাণ-অনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন"
গর্জিলা দুমরাজ॥

মাড়োয়ার হতে দূত আসি বলে,
"বৃথা এ সৈন্যসাজ।

হেরো এ প্রভুর আদেশপত্র,
দুর্গেশ দুমরাজ।
সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাহার
ফিরিঙ্গি সেনাপতি—
সাদরে তাঁদের ছাড়িবে দুর্গ,
আজ্ঞা তোমার প্রতি।
বিজয়লক্ষ্মী হয়েছে বিমুখ
বিজয়সিংহ-'পরে ;
বিনা সংগ্রামে আজমীর-গড়
দিবে মারাঠার করে।”
“প্রভুর আদেশে বীরের ধর্মে
বিরোধ বাধিল আজ”
নিশ্বাস ফেলি কহিলা কাতরে
দুর্গেশ দুমরাজ॥

মাড়োয়ার-দূত করিল ঘোষণা,
“ছাড়ো ছাড়ো রণসাজ।”
রহিল পাষাণ-মুরতি-সমান
দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা যায়-যায়, ধূধূ করে মাঠ,
দূরে দূরে চরে ধেনু—

তরুতলছায়ে সকরুণ রবে
বাজে রাখালের বেণু।
"আজমীর-গড় দিলা যবে মোরে
পণ করিলাম মনে—
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে
ছাড়িব না এ জীবনে!
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায়
ভাঙিতে হবে কি আজ"—
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিশ্বাস
দুর্গেশ দুমরাজ॥

রাজপুত সেনা সরোষে শরমে
ছাড়িল সমরসাজ।
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে
দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়াবসনা সন্ধ্যা নামিল
পশ্চিম-মাঠ-পারে;
মারাঠী সৈন্য ধুলা উড়াইয়া
থামিল দুর্গদ্বারে।
"দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান,
ওঠো ওঠো, খোলো দ্বার"—

নাহি শোনে কেহ, প্রাণহীন দেহ
সাড়া নাহি দিল আর।
প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে
বিরোধ মিটাতে আজ
দুর্গদুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ
দুর্গেশ দুমরাজ ॥

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর ;
যা-কিছু হারায় গিন্নি বলেন, "কেষ্টা বেটাই চোর।"
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে ;
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ, চীৎকার করি "কেষ্টা"—
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে ;
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহাকলরবে গালি দেই যবে "পাজি ! হতভাগা ! গাধা !"
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় পিত্ত ;
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার, বড়ো পুরাতন ভৃত্য ॥

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, "আর পারি নাকো !
রহিল তোমার এ ঘর-দুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।
গেলে সে বাজার সারা দিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার—
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর ?"

শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধ'রে—
বলি তারে, "পাজি, বেরো তুই আজই, দূর ক'রে দিনু তোরে।"
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায় ; পরদিন উঠে দেখি,
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতর চিত্ত ;
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে— মোর পুরাতন ভৃত্য ॥

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি ;
করিলাম মন, শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায় ; বুঝায়ে বলিনু তারে,
"পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।"
লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।"
আমি কহিলাম, "আরে রাম রাম! নিবারণ সাথে যাবে।"
রেলগাড়ি ধায় ; হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতিপ্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে।
স্পর্ধা তাহার হেনমতে আর কত-বা সহিব নিত্য!
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি হেরি পুরাতন ভৃত্য ॥

নামিনু শ্রীধামে ; দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।

জন-ছয়-সাতে মিলি একসাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা ; মনে হল আশা, আরামে দিবস যাবে।
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি !
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত ! আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ—
আমি একা ঘরে, ব্যাধিখরশরে ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ, "কেষ্টা, আয় রে কাছে।
এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।'
হেরি তার মুখ ভ'রে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত—
নিশিদিন ধ'রে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য॥

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত ;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বারবার "কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন—
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানীরে দেখিতে পাইবে পুন।'
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম, তাহারে ধরিল জ্বরে ;
নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ-'পরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু দিন, বন্ধ হইল নাড়ি—
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি।
বহু দিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ ;
আজ সাথে নেই চিরসাথি সেই মোর পুরাতন ভৃত্য॥

নকল গড়

রাজস্থান

“জলস্পর্শ করব না আর”
চিতোর-রাণার পণ—
“বুঁদির কেল্লা মাটির ’পরে
থাকবে যতক্ষণ।”
“কী প্রতিজ্ঞা, হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন ক’রে সাধবে তা আজ”
কহেন মন্ত্রিগণ।
কহেন রাজা, “সাধ্য না হয়
সাধব আমার পণ।”

বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে
যোজন-তিনেক দূর।
সেথায় হারাবংশী সবাই
মহা মহা শূর।
হামু রাজা দিচ্ছে থানা,
ভয় কারে কয় নাইকো জানা,
তাহার সদ্য প্রমাণ রাণা
পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি
যোজন-তিনেক দূর॥

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি,
"আজকে সারা রাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো
নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির 'পরে—
নইলে শুধু কথার তরে
হবেন আত্মঘাতী।"
মন্ত্রী দিল চিতোর-মাঝে
নকল কেল্লা পাতি॥

কুম্ভ ছিল রাণার ভৃত্য
হারাবংশী বীর,
হরিণ মেরে আসছে ফিরে
স্কন্ধে ধনু তীর।
খবর পেয়ে কহে, "কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে
করবে নতশির?
নকল বুঁদি রাখব আমি
হারাবংশী বীর।"

মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন
রাণা মহারাজ ;
"দূরে রহো" কহে কুম্ভ,
গর্জে যেন বাজ—
"বুঁদির নামে করবে খেলা
সইব না সে অবহেলা—
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
রাখব আমি আজ।"
কহে কুম্ভ, "দূরে রহো,
রাণা মহারাজ।"

ভূমির 'পরে জানু পাতি
তুলি ধনুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে
নকল বুঁদিগড়।
রাণার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে—
খেলাগড়ের সিংহদ্বারে
পড়ল ভূমি-'পর।
রক্তে তাহার ধন্য হল
নকল বুঁদিগড়॥

পূজার সাজ

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি,
পূজার সময় এল কাছে ;
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই,
আনন্দে দু হাত তুলি নাচে।
পিতা বসি ছিল দ্বারে, দুজনে শুধালো তারে,
"কী পোষাক আনিয়াছ কিনে ?"
পিতা কহে, "আছে, আছে, তোদের মায়ের কাছে,
দেখিতে পাইবি ঠিক দিনে।"

সবুর সহে না আর, জননীরে বারবার
কহে, "মা গো, ধরি তোর পায়ে,
বাবা আমাদের তরে কী কিনে এনেছে ঘরে
একবার দে-না মা, দেখায়ে।"
ব্যস্ত দেখি হাসিয়া মা দুখানি ছিটের জামা
দেখাইল করিয়া আদর।
মধু কহে, "আর নেই ?" মা কহিল, "আছে এই
একজোড়া ধুতি ও চাদর।"

রাগিয়া আগুন ছেলে, কাপড় ধুলায় ফেলে
কাঁদিয়া কহিল, "চাহি না মা!
রায়বাবুদের গুপি পেয়েছে জরির টুপি,
ফুলকাটা সাটিনের জামা।"
মা কহিল, "মধু, ছিছি, কেন কাঁদ মিছামিছি,
গরিব যে তোমাদের বাপ—
এবার হয় নি ধান, কত গেছে লোকসান,
পেয়েছেন কত দুঃখ তাপ।
তবু দেখো বহু ক্লেশে তোমাদের ভালোবেসে
সাধ্যমতো এনেছেন কিনে—
সে জিনিস অনাদরে ফেলিলি ধূলির 'পরে,
এই শিক্ষা হল এতদিনে!"
বিধু বলে, "এ কাপড় পছন্দ হয়েছে মোর,
এই জামা পরাস আমারে।"
মধু শুনে আরো রেগে ঘর ছেড়ে দ্রুতবেগে
গেল রায়বাবুদের দ্বারে॥

সেথা মেলা লোক জড়ো, রায়বাবু ব্যস্ত বড়ো,
দালান সাজাতে গেছে রাত—
মধু যবে এক কোণে দাঁড়াইল ম্লানমনে
চোখে তাঁর পড়িল হঠাৎ।

কাছে ডাকি স্নেহভরে কহেন করুণ স্বরে
তারে দুই বাহুতে বাঁধিয়া,
"কী রে মধু, হয়েছে কী ! তোরে যে শুকনো দেখি !"
শুনি মধু উঠিল কাঁদিয়া।
কহিল, "আমার তরে বাবা আনিয়াছে ঘরে
শুধু এক ছিটের কাপড়।"
শুনি রায়মহাশয় হাসিয়া মধুরে কয়,
"সেজন্য ভাবনা কী বা তোর !"
ছেলেরে ডাকিয়া চুপি কহিলেন, "ওরে গুপি,
তোর জামা দে তুই মধুরে।"
গুপির সে জামা পেয়ে মধু ঘরে যায় ধেয়ে,
হাসি আর মুখে নাহি ধরে।
বুক ফুলাইয়া চলে, সবারে ডাকিয়া বলে,
"দেখো কাকা, দেখো চেয়ে মামা—
ওই আমাদের বিধু ছিট পরিয়াছে শুধু,
মোর গায়ে সাটিনের জামা।"

মা শুনি কহেন আসি লাজে অশ্রুজলে ভাসি
কপালে করিয়া করাঘাত,
"হই দুঃখী, হই দীন, কাহারো রাখি না ঋণ,
কারো কাছে পাতি নাই হাত—

তুমি আমাদেরি ছেলে ভিক্ষা লয়ে অবহেলে
অহংকার করো ধেয়ে ধেয়ে !
ছেঁড়া ধুতি আপনার, ঢের বেশি দাম তার
ভিক্ষা-করা সাটিনের চেয়ে।
আয় বিধু, আয় বুকে, চুমো খাই চাঁদমুখে—
তোর সাজ সব-চেয়ে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো।”

জলযাত্রা

নৌকো বেঁধে কোথায় গেল, যা ভাই, মাঝি ডাকতে,
মহেশগঞ্জে যেতে হবে শীতের বেলা থাকতে।
পাশের গাঁয়ে ব্যাবসা করে ভাগ্নে আমার বলাই,
তার আড়তে আসব বেচে খেতের নতুন কলাই।
সেখান থেকে বাহুড়ঘাটা আন্দাজ তিন পোয়া,
যহুঘোষের দোকান থেকে নেব খইয়ের মোয়া।
পেরিয়ে যাব চন্দনীদ' মুন্সিপাড়া দিয়ে ;
মাল্‌সি যাব, পুঁটুকি সেথায় থাকে মায়ে ঝিয়ে।
ওদের ঘরে সেরে নেব তুপুরবেলার খাওয়া ;
তার পরেতে মেলে যদি পালের যোগ্য হাওয়া
এক পহরে চলে যাব মুখ্‌লুচরের ঘাটে,
যেতে যেতে সন্ধে হবে খড়কেডাঙার হাটে।
সেথায় থাকে নওয়াপাড়ায় পিসি আমার আপন ;
তার বাড়িতে উঠব গিয়ে, করব রাত্রিযাপন।
তিন পহরে শেয়ালগুলো উঠবে যখন ডেকে
ছাড়ব শয়ন ঝাউয়ের মাথায় শুকতারাটি দেখে।
লাগবে আলোর পরশমণি পুব-আকাশের দিকে,
একটু ক'রে আঁধার হবে ফিকে।
বাঁশের বনে একটি-তুটি কাক
দেবে প্রথম ডাক।
সদর-পথের ঐ পারেতে গোঁসাইবাড়ির ছাদ
আড়াল করে নামিয়ে নেবে একাদশীর চাঁদ।

উস্কুখুস্কু করবে হাওয়া শিরীষগাছের পাতায়,
রাঙা রঙের ছোঁয়া দেবে দেউল-চুড়োর মাথায়।
বোষ্টমি সে ঠুনুঠুনু বাজাবে মন্দিরা,
সকালবেলার কাজ আছে তার নাম শুনিয়ে ফিরা।
হেলে দুলে পোষা হাঁসের দল
যেতে যেতে জলের পথে করবে কোলাহল।
আমারও পথ হাঁসের যে পথ, জলের পথে যাত্রী,
ভাসতে যাব ঘাটে ঘাটে ফুরোবে যেই রাত্রি।
সাঁতার কাটব জোয়ার-জলে পৌঁছে উজিরপুরে,
শুকিয়ে নেব ভিজে ধুতি বালিতে রোদ্‌দুরে।
গিয়ে ভজনঘাটা
কিনব বেগুন পটোল মুলো, কিনব সজনেডাঁটা।
পৌঁছব আটবাঁকে,
সূর্য উঠবে মাঝগগনে, মহিষ নামবে পাঁকে।
কোকিল-ডাকা বকুল-তলায় রাঁধব আপন হাতে,
কলার পাতায় মেখে নেব গাওয়া ঘি আর ভাতে।
মাখ্‌নাগাঁয়ে পাল নামাবে, বাতাস যাবে থেমে;
বনঝাউ-ঝোপ রঙিয়ে দিয়ে সূর্য পড়বে নেমে।
বাঁকাদিঘির ঘাটে যাব যখন সন্ধে হবে
গোষ্ঠে-ফেরা ধেনুর হাম্বারবে।
ভেঙে-পড়া ডিঙির মতো হেলে-পড়া দিন
তারা-ভাসা আঁধার-তলায় কোথায় হবে লীন॥

মস্তকবিক্রয়

মহাবস্তুবদান

কোশলনৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি যশোগাথা।
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই,
দীনের তিনি পিতামাতা।
সে কথা কাশীরাজ শুনিতে পেয়ে
জ্বলিয়া মরে অভিমানে—
"আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড়ো করি মানে!
আমার হতে যার আসন নীচে
তাহার দান হল বেশি!
ধর্ম দয়া মায়া সকলি মিছে,
এ শুধু তার রেষারেষি।"
কহিলা, "সেনাপতি, ধরো কৃপাণ,
সৈন্য করো সব জড়ো।
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান,
স্পর্ধা বাড়িয়াছে বড়ো!"
চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধসাজে—
কোশলরাজ হারি রণে

রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে
পলায়ে গেল দূর বনে।
কাশীর রাজা হাসি কহে তখন
আপন সভাসদ্-মাঝে—
"ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে।"

সকলে কাঁদি বলে, "দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে!
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু,
চাহে না ধর্ম্মের পানে!"
"আমরা হইলাম পিতৃহারা"
কাঁদিয়া কহে দশ দিক্,
"সকল জগতের বন্ধু যাঁরা
তাঁদের শত্রুরে ধিক্।"
শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি—
"নগরে কেন এত শোক!
আমি তো আছি, তবু কাহার লাগি
কাঁদিয়া মরে যত লোক!
আমার বাহুবলে হারিয়া তবু
আমারে করিবে সে জয়!

অরির শেষ:নাহি রাখিবে কভু,
শাস্ত্রে এইমতো কয়।
মন্ত্রী, রটি দাও নগর-মাঝে,
ঘোষণা করো চারি ধারে—
যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে
কনক শত দিব তারে।”
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী
রটনা করে দিনরাত—
যে শোনে, আঁখি মুদি রসনা কাটি
শিহরি কানে দেয় হাত॥

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিনচীর দীনবেশে।
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে,
“কোথা গো বনবাসী, বনের শেষ,
কোশলে যাব কোন্ মুখে।”
শুনিয়া রাজা কহে, “অভাগা দেশ,
সেথায় যাবে কোন্ দুখে।”
পথিক কহে, “আমি বণিকজাতি,
ডুবিয়া গেছে মোর তরী।

এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি
কেমনে রব প্রাণ ধরি!
করুণাপারাবার কোশলপতি,
শুনেছি নাম চারি ধারে।
অনাথনাথ তিনি দীনের গতি—
চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে।”
শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি;
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিশ্বাস ছাড়ি,
“পান্থ, যেথা তব বাসনা পূরে
দেখায়ে দিব তারি পথ;
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে,
সিদ্ধ হবে মনোরথ।”

বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে;
দাঁড়ালো জটাধারী এসে।
“হেথায় আগমন কিসের কাজে”
নৃপতি শুধাইল হেসে।
“কোশলরাজ আমি বনভবন”
কহিলা বনবাসী ধীরে,

"আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ,
দেহো তা মোর সাথিটিরে।"
উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হল গৃহতল ;
বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল্।
মৌন রহি রাজা ক্ষণেক-তরে
হাসিয়া কহে, "ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি !
তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে—
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে।"
জীর্ণ-চীর-পরা বনবাসীরে
বসালো নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে—
ধন্য কহে পুরজনে॥

বীরপুরুষ

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা, চ'ড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার্ 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধূলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে॥

সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূ ধূ করে যে দিক পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই—
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ ; ভাবছ, "এলেম কোথা !"
আমি বলছি, "ভয় কোরো না মা গো,
ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।"

চোরকাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে,
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে—
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
"দিঘির ধারে ঐ-যে কিসের আলো।"

এমন সময় "হারে রে রে রে রে"
ঐ-যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পাল্কিতে এক কোণে
ঠাকুর-দেব্‌তা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্কি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
"আমি আছি, ভয় কেন মা, কর।"

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল—
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।

আমি বলি, "দাঁড়া, খবরদার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর,
এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার,
টুক্‌রো ক'রে দেব তোদের সেরে।"
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল, "হারে রে রে রে রে!"

তুমি বললে, "যাস নে খোকা ওরে!"
আমি বলি, "দেখো-না চুপ করে।"
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা॥

এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, "লড়াই গেছে থেমে।"

তুমি শুনে পাল্কি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে ;
বলছ, "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল !
কী দুর্দশাই হ'ত তা না হলে !"

রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হ'ত তবে,
শুনত যারা অবাক হ'ত সবে—
দাদা বলত, "কেমন করে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।"
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
"ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।"

———